বিখ্যাত

বিচার ও তদন্ত-কাহিনী

প্রথম পর্ব

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

এম, এস্-সি, ডি-ফিল,

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

প্রচ্ছদপটশিল্পী :
শ্রীপূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ, মাঘ—১৩৬৭
দ্বিতীয় প্রকাশ, চৈত্র—১৩৬৯

উৎসর্গ

কলিকাতা মহানগরীর

নগরপাল—

সুপণ্ডিত

শ্রীযুক্ত উপানন্দ মুখোপাধ্যায়, আই-পি

মহোদয়কে

শ্রদ্ধার সহিত

পঞ্চানন

ডঃ শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল

প্রণীত

—অন্যান্য গ্রন্থ—

অপরাধ-বিজ্ঞান

১ম—৮ম খণ্ড।

১ম খণ্ড—৬৲ [illegible]য় খণ্ড—৫৲

৫ম খণ্ড—৬৲ ৬ষ্ঠ খণ্ড—৫৲

অন্যান্য প্রতি খণ্ড—৪৲

হিন্দু-প্রাণিবিজ্ঞান ৫৲

মুণ্ডহীন দেহ ৩.২৫

বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত-কাহিনী

১ম পর্ব—[illegible]৲ ২য় পর্ব—[illegible]৲

৩য় পর্ব—৩.৫০

অন্ধকারের দেশে ৩.৫০

দুই পক্ষ ২.৫০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা ৬

যে সকল মামলা সম্বন্ধে এই পুস্তকে বলা হয়েছে উহার সব কয়টিরই তদন্ত-কার্য কলিকাতার আরক্ষা পুরুষদের দ্বারা সমাধা হয়েছিল। তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে কয়েকটি বিষয়ে কলিকাতা-পুলিশ বহুকথিক ইঙ্গ-স্থানীয় স্কটল্যাণ্ড-ইআর্ড অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ, যে সকল তদন্ত-কার্য য়ুরোপীয় "ববি"গণ অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণের সাহায্যে করে থাকেন সেইরূপ তদন্ত-কার্যই ভারতীয় পুলিশকে করে যেতে হয়েছে ঐ সকল আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকেই। বস্তুতপক্ষে বেতার-যন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ বৈজ্ঞানিক পন্থার সাহায্য এই দেশের স্বাধীনতার পরই মাত্র প্রকৃতপক্ষে গৃহীত হয়েছে। উপরন্তু লণ্ডন পুলিশ জনসাধারণের নিকট যে সহযোগিতা বহুকাল পূর্ব হতেই পেয়ে এসেছে, সেইরূপ স্বয়ংক্রিয় সহযোগিতা ভারতীয় পুলিশ বহু দিন পায় নি। এ'ছাড়া কলিকাতা পুলিশের অপর আর এক অসুবিধাও আছে। কারণ তাদের অনেককেই এই শহরে মানুষ হয়ে ও লেখাপড়া শিখে এই শহরের পুলিশেই ভর্তি হতে হয়েছে। শহরে অগণিত পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে কাজ করার সুবিধার ন্যায় অসুবিধাও অনেক থাকে। এই কারণে তাহাদের মুহুর্মুহু লভ্ ও ডিউটির মধ্যে বেছে নিতে হয়েছে ডিউটিকে। এ'ছাড়া এদের পুরাতন ট্রেনিং স্কুলগুলিতে পুলিশি আইন-কানুন, ড্রিল, প্যারেড ও ডিসিপ্লিন শেখানো হলেও পুলিশি তদন্তরীতি কোনও দিনই শিখানো হয় নি। এই তদন্ত-কার্য

তাদের শিখে নিতে হয়েছে ট্রেনিং স্কুলের বাহিরে এসে তৎকালীন সুদক্ষ দর্শীয় অফিসারদের নিকট হতে। এই সকল পুরাতন অফিসারগণ গুরু পরম্পরায় যে জ্ঞান অর্জন করতেন, সেই জ্ঞান আবার তাঁরা দিয়ে যেতেন এই বিভাগের নবাগত অফিসারদের। এই জ্ঞান কর্তৃপক্ষের অগোচরে যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, কিন্তু উহার সংটুকু বহুদিন পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা হয় নি। এখানকার এই সকল শিক্ষা-গুরুদের নবাগতদের শিক্ষিত করে তুলতেও বেশ কিছু বেগ পেতে হতো। কারণ ইহাদের অধিকাংশই ছিল সুশিক্ষিত শহরের যুবক। বহু প্রকার চিত্ত-প্রস্তুতির কারণে এই সকল আত্মাভিমানী যুবক আপন আপন ধারণা অনুযায়ী কাজ করতে চেয়েছে। এইজন্য তাদের এই সব বদ্ধমূল ধারণা বদলে তাদের মধ্যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি আনতে তাদের ঐরূপ শিক্ষা দিতে গুরুদের বহু সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে।

কিন্তু এতো অসুবিধার মধ্যেও কলিকাতা পুলিশ যেরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে তা বিলাতি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড পুলিশের কৃতিত্বের তুলনায় কম তো নয়ই বরং উহাদের অতুলনীয়ই বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ পুলিশের পিছনে যেরূপ খরচ-খরচা করেছেন, তাঁরা সেইরূপ খরচ-খরচা তাঁদের ভারতীয় পুলিশের জন্য কোনও দিনই করেন নি। এই সকল স্বল্প বেতনভোগী ভারতীয় তদন্তকারী অফিসারদেরই বরং তদন্ত-কার্যে সাফল্যের জন্য এবং জনসাধারণের উপকারার্থে নিজেদের পকেট হতেই পয়সা খরচ করে বদান্যতা দেখাতে হয়েছে।

ভারতীয় কৃষ্টি অনুযায়ী এই সকল পুরাতন অফিসারগণ তাঁদের সহকারীদের তাঁদেরই মত তদন্ত-কার্যে শিক্ষিত করে তোলা তাঁদের শুধু কর্তব্য নয়, ধর্ম মনে করতেন। এইজন্য প্রতিটি তদন্ত-কার্যে

এঁরা নবাগতদের তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে রা তেন। এই নবাগতরা শুধু দেখে যেতো তাঁরা কেমন করে কি করছেন এবং কি বা তাঁরা করছেন না। বহুক্ষেত্রে তারা নবাগতদের জিজ্ঞাসা করেছে, বলতো এইবার কি করতে হবে?' নবাগতগণ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁরা বলে দিতেন, ইরূপ করলে এই এই অসুবিধা আছে। নচেৎ এই এই সুবিধা হত—বুঝলে? এই ভাবে কলিকাতা পুলিশ তাদের যা কিছু শিক্ষাদীক্ষা, তা পুঁথিগত ভাবে পায় নি, সুদক্ষ ও অভিজ্ঞদের কাছেই তারা ঐ তদন্ত কার্য শিখেছে হাতে কলমে।

এখন জিজ্ঞাস্য হতে পারে অধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্য না নিয়ে কলিকাতা পুলিশ এত বেশি দক্ষতা দেখাতে পারে কি করে? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে, কলিকাতা পুলিশ যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতার উপর নির্ভর না করে তারা নির্ভর করেছেন উহাদের ব্যবহার চাতুর্যের উপর। স্বল্প লাইন দ্বারা যে ব্যক্তি অধিক এফেক্ট প্রকাশ করতে সক্ষম সে-ই প্রকৃত আর্টিস্ট। তাই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলেও নিজেদের তৈরি অতি সাধারণ (Simple) যন্ত্রপাতিই তাঁরা তদন্ত-কার্যে ব্যবহার করেছেন। তবে যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল না হয়ে তাঁরা নির্ভর করেছেন, নিজেদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পূর্ব-অভিজ্ঞতা এবং স্বয়ংলব্ধ সমাজ-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যকালে জনৈক আমেরিকান জেনারেল বন্ধুগণ সহ কলিকাতায় এসে কালীঘাটের মন্দির পরিদর্শনে যান। মন্দির কর্তৃপক্ষ অবশ্য জুতা খুলে তাঁদের প্রাঙ্গণে ঘুরাফিরা করার জন্য কোনও আপত্তি করেন নি। তাঁরা গেটের দুয়ারের নিকট জুতা খুলে রেখে প্রাঙ্গণের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করে ফিরে এসে দেখলেন যে,

জেনারেল সাহেবের মূল্যবান 'সু' জোড়াটি অপহৃত হয়েছে। মনঃক্ষুণ্ণ-ভাবে জেনারেল সাহেব কলিকাতা পুলিশের য়ুরোপীয় কমিশনারের নিকট জুতা-চুরি সম্বন্ধে অভিযোগ জানানো মাত্র পুলিশ বিভাগে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল এবং তিনি অভিমত প্রকাশ করলেন যে, ত্বরিত গতিতে ঐ জুতা উদ্ধার করে দিতে না পারলে বিদেশীয়দের নিকট কলিকাতা পুলিশের মান-ইজ্জতের সমধিক হানি হবার সম্ভাবনা। এখন তদন্ত-কার্যে বিশেষ করে আমারই ডাক পড়েছিল। আমাকে কমিশনার সাহেবের নিকট নিয়ে যাওয়া হলে, তিনি বললেন, 'লণ্ডন পুলিশ এই জুতা তিন ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করতে পারত, তুমি কতক্ষণে উহা উদ্ধার করতে পারবে?' উত্তরে আমি তাঁকে জানালুম, 'স্যার, ঐ জুতা পূর্ব দিন বেলা তিনটা আন্দাজ সময় অপহৃত হয়েছে। তাই তিন ঘণ্টায় উহাদের খুঁজে বার করা সম্ভব নয়, কারণ ইতিমধ্যেই বহু দেরি হয়ে গিয়েছে। আমি অন্ততপক্ষে ছয় সাত বা নয় ঘণ্টা সময় চাই।' কমিশনার সাহেবের মনে কি ছিল জানি না, তিনি আমার উত্তরে বরং খুশি হয়েই বলে উঠলেন, 'বেশ বেশ, সে-তো ভালই। এখন সকাল দশটা—আচ্ছা, তাহলে সন্ধ্যার পূর্বেই একটা সুখবর পাব আশা করি।'

এরপর লালবাজার হতে সোজা আমি ভাবানীপুর থানায় চলে এলাম। সেখানে এসে দেখলাম ভারপ্রাপ্ত অফিসার এই জুতা-চুরি সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত, কারণ তাঁরই এলাকাধীন স্থানে এই অপকার্যটি সাধিত হয়েছে। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঠিক কটার সময় এই চুরিটা হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?' উত্তরে হতাশ হয়ে তিনি জানালেন, 'ঠিক দুইটার সময়। তিনটায় আমেরিকান মিলিটারি পুলিশ এসে কেস লিখিয়েছে।' 'হুঁ তাহলে ঠিক হয়েছে,'—আমি উত্তর

করলাম, 'আপনি এক কাজ করুন এক্ষুনিই। জন দশবারো জমাদার ও পুরানো অভিজ্ঞ সিপাহী এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন। তারা একটা হতে তিনটা পর্যন্ত অর্থাৎ যে সময়ে চুরি হয়েছে ঐ সময়ে মন্দির ও উহার চতুর্দিকে ঘুরাফিরা করে যে কোন ব্যক্তিকে ভ্যাগাবণ্ড বা জুতা-চোররূপে সন্দেহ হবে, তাদের সব ক'জনকেই ছাঁকা জালে মাছ তুলার ন্যায় ধরে ধরে থানায় নিয়ে আসুক। অফিসার-ইন্-চার্জ ভদ্রলোকের নানা কারণে আমার উপর আস্থা ছিল। তাছাড়া গোয়েন্দা বিভাগের ব্যক্তি বিধায় আমাকে সাহায্য করা ছিল তাঁর অন্যতম কর্তব্য। তিনি সানন্দে বাছা বাছা দশ বারো জন জমাদার সিপাহীকে অনুরূপ আদেশসহ ঐ সময়ের মধ্যে মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এর পর আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিশ্চিন্ত মনে ও স্থির মস্তিষ্কে একটি পুঁটুলি হাতে নিয়ে থানায় এসে দেখি, প্রায় ত্রিশ জন অনুরূপ ব্যক্তিকে ধরে এনে থানার একটা পৃথক কামরায় জমা করা হয়েছে। আমি ঐ নির্দিষ্ট কামরায় এসে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ ও জিজ্ঞাসাবাদ করে ওদের মধ্য হতে মাত্র এগারো জন ব্যক্তিকে বেছে নিয়ে বাকি সকলকে মুক্তি দিতে বলে থানার অফিসার-ইন চার্জের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে এসে বসলাম। এই ঘরে আমার সঙ্গে করে আনা পুঁটুলিটি ইতিপূর্বেই আমি রেখে গিয়েছিলাম। সকলে বিস্মিত হয়ে দেখল, আমি পুঁটুলি খুলে ভাল ভাল আনকোরা নূতন মরক্কো ও অন্যান্য লেদারের দশ বারো পাটি জুতা বার করে ঘরের একপাশে দেওয়ালের ধারে জড়ো করে রাখছি। সকলে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে তাকালে, আমি তাদের কথা বলতে বারণ করে পাশের ঘর থেকে আমার বাছাই করা এগারো জন ব্যক্তিকে এই ঘরটিতে এনে দেওয়ালের এমন এক ধারে সারিবন্দী

ভাবে তাদের দাঁড় করাতে বললাম, যেখান হতে উল্টো দিকে রাখা জুতা কয়টি সহজেই তাদের নজরে পড়তে পারে। এইভাবে ঐ এগার জন সন্দেহমান ব্যক্তিকে দেওয়ালের পাশে সারবন্দীভাবে দাঁড় করানো হলে, আমি বহুক্ষণ ছুতা করে একটি কাগজ দেখতে লাগলাম, কিন্তু এর মধ্যে আমি তাদের হাবভাব যে লক্ষ্য না করছিলাম তা'ও নয়। এর পর আমি মুখ তুলে অন্যমনস্ক ভাবে অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্দেহমান প্রত্যেকটি ব্যক্তির মুখের দিকে চেয়ে দেখতে থাকি। হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়ল এদের এক ব্যক্তির মুখ-চোখের দিকে। লোকটি ঘন ঘন প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে ঐ নূতন জুতা জোড়া কয়টির দিকে বারবার চেয়ে দেখছিল। ঐ স্থানে অতগুলি জুতা দেখে খাদ্য-প্রাপ্তির সম্ভাবনা যেমন বুভুক্ষু মানুষকে উতলা করে, ঠিক তেমনি করে ঐ জুতা-সন্ধানীকে উতলা করে তুলেছে। কারণ, জুতা-চুরি করে করে (অভ্যাস জনিত) তার ব্রেনের 'সেট-আপ' আপনিই এমন হয়ে গেছে যে, সহজেই তার মানুষের পায়ের দিকেই আগে নজর পড়ে। এই অবস্থায় তার চক্ষু চকচকে হয়ে উঠবে এবং মুখে যে লাল পড়বে তাতে আর আশ্চর্যেরই বা কি আছে। আমি নীরবে ইহার অপরাপর সঙ্গীদের মুখাবয়বের সহিত উহার মুখ-চোখের তুলনা করে বুঝলাম যে, আমি কোনও ভুল সিদ্ধান্তে আসি নি। আমি তৎক্ষণাৎ ঐ ব্যক্তিকে রেখে বাকি সকলকে বললাম, 'যাও তোমরা। যা কিছু দোষ এই লোকটির; তোমরা কোনও অপরাধ করো নি।' ঐ সকল ব্যক্তিকে বিদায় দিয়ে দরজা বন্ধ করে আমি নিভৃতে সেই জুতা-চোরটিকে বললাম, 'বাপু, জুতা-চোর! দেখচো তো এতগুলো লোকের মধ্য হতে আমি তোমাকেই কেমন চিনে নিলাম। এতেই বুঝতে পারছো যে, আগে থেকে আমাদের এ খবর জানা ছিল যে, তুমি ঐ দিন ঐ ফৌজী সাহেবের

জুতা দু'টো মন্দির হতে চুরি করেছো, তা না হলে কি অতগুলো লোকের মধ্যে শুধু তোমাকেই বেছে নিতে পারতাম? দেখলে তো শুধু তোমাকেই বেছে নিয়েছি। এখন এতটা যখন জানি তখন এ'ও জানি তুমি কোথায় ও-দু'টো বিক্রয় করে এসেছ। এখন তুমি নিজেই যদি দোকানটা দেখিয়ে দাও তাহলে আর আমাদের ইনফরমারকে কষ্ট করে সেই বেলঘেছে থেকে ডেকে আনতে হয় না। কেন মিছামিছি অপ্রীতিকর (?) ব্যাপারের সৃষ্টি করবে, তার চেয়ে দাও একটা বিড়ি টিড়ি খাও আর শান্তশিষ্ট ছেলের মত সেই দোকানটা দেখিয়ে দেবে চলো।' জুতা-চোর মহাশয় সত্য সত্যই আমাদের এই কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার এ'ও মনে হয়েছিল যে, ঐ চোরাই জুতা কোথায় আছে তা ঐ ইনফরমারের সাহায্যে আমরা ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছি। একটু এদিক ওদিক চেয়ে কিন্তু-কিন্তু করতে করতে জুতা-চোরটি অনুযোগ করে জানালো, 'হাঁ হুজুর, সবই যখন আপনারা জেনে গেছেন, তখন আপনাদের আমি আর কষ্ট দেবো না। তবে একটা কথা, এ তল্লাটের সেয়ানারা সব আমাকে একজন বড়দরের চোর বলে জানে ও খাতির করে। আমি যে জুতা-চোর তা জানাজানি হলে সকলের কাছে আমার বড় বদনাম হবে। চলুন, স্যার, আমি দূর হতে সেই চীনাম্যানের দোকানটা দেখিয়ে দেবো। খুব সম্ভবত এর মধ্যে সে ও-দু'টো বিক্রি করতে পারে নি।' আমি উৎফুল্ল হয়ে তৎক্ষণাৎ একটি ট্যাক্সি ডেকে অপরাধীকে নিয়ে ঐ দোকানের নিকট যাই এবং ঐ দোকান হতে দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর সামনে অপহৃত জুতা জোড়াটি উদ্ধার করতে সমর্থ হই। এর পর আমেরিকান জেনারেল সাহেব ঐ জুতা দু'টো আপন দ্রব্য বলে সনাক্ত করে স্বীকার করেছিলেন

যে, চুরির পর এত শীঘ্র চোরাই দ্রব্য উদ্ধার করতে য়ুরোপীয় বা ব্রিটিশ পুলিশ কম ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়েছেন।

এইখানে সাধারণ মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের সহিত আমাকে গুরুপরম্পরায় অর্জিত অভিজ্ঞতাও কাজে লাগাতে হয়েছিল। এই সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল যে, জুতা-চোরগণ একক চোর হয় এবং তারা দলবদ্ধ চোর নয়। ভারতীয় অপরাধী সমাজে ইহা এক অতি ছোট ও নোংরা কাজ বিধায় একে অপরের অজ্ঞাতে এই প্রকার চুরি করে থাকে। এইজন্য একজন জুতা-চোর যেস্থানে কর্মরত থাকে, সেইখানে অপর এক জুতা-চোর প্রায়ই তিষ্ঠায় পর্যন্ত না। এদের একজন অপর জনকে এই ছোট কাজে লিপ্ত দেখলে উভয়েই লজ্জিত হয়ে উঠে। এইজন্য এরা পরস্পর পরস্পরের অগোচরেই দূরে চলে গিয়ে পৃথক কর্মক্ষেত্র বেছে নেয়। এ'ছাড়া বড় বড় চোরদের মনের যে 'গার্ড' থাকে জুতা-চোরদের তা থাকে না। তারা স্বভাবতই ভীরু প্রকৃতির ও সরল স্বভাবের হয়ে থাকে। এইজন্য আমি তদনুরূপ বাক্‌বিন্যাসই তার উপর প্রয়োগ করেছিলাম। আমার এবংবিধ কৃতকার্যতার ইহাও ছিল অন্যতম কারণ।"

উপরের দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে কিরূপ সবল ভাবে সামান্য সময়ের মধ্যে কলিকাতা পুলিশ কার্য করতে সক্ষম। কিন্তু এইস্থলে লণ্ডন পুলিশে হুলুস্থুল পড়ে যেতো। তাঁরা প্রথমেই ঘটনাস্থলে এসে ঐ ভিড়ের মধ্যে পদচিহ্ন সংগ্রহের জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করতেন। তারপর তাঁরা বহু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনও হদিস না পেলে ছুটে যেতেন মোডাস অপারেণ্ডাই ব্যুরোতে বা অপরাধীদের কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কীয় রেকর্ড অফিসে। এই কার্য-পদ্ধতি অফিসে বিভিন্ন অপরাধীদের বিভিন্ন কার্য-পদ্ধতি সম্পর্কীয় সহস্র সহস্র কার্ড র‍্যাকের

বিভিন্ন খোপে বা পিজিয়ন-হোলে রক্ষিত আছে। এইখানে কোন্ অপরাধী কত লম্বা, কার চুলের রঙ কিরূপ, কোন্ ব্যক্তি নেংড়া বা খঞ্জ, ইত্যাদি সংবাদও নথিভুক্ত আছে। সাধারণত অপরাধীদের অপপদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে উহাদের নাম ধাম সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যেতে পারে।

এইরূপ বিবরণ সম্বলিত বহু কার্ড পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা সম্ভবমত প্রায় আট-নয়টি অপরাধীর নাম-ধাম, বিবরণ ও উহাদের বন্ধুবান্ধবদের নাম সংগ্রহ করে ঐ অপহৃত জুতার বিবরণ সহ ঐ সকল সংবাদ তৎক্ষণাৎ গেজেটে ছাপিয়ে উহা ভ্যান, মেল বা লোক মারফৎ প্রতিটি থানায় পাঠিয়ে কিম্বা টেলিফোন বা রেডিও যোগে ঐ সকল থানায় এই সম্পর্কে সংবাদ প্রেরণ করতেন। তার পর একে একে তাদের পাকড়াও করে অকুস্থলের লোকজনদের এবং ফরিয়াদীকে সনাক্তি-করণ মিছিলের (Test Identification Parade) সাহায্যে তাদের সনাক্ত করাবার চেষ্টা করতেন। এরপর লণ্ডন পুলিশের অপর একদল হয়ত প্রকাশ্যে বা ছদ্মবেশে ঐ জুতার বিবরণ সহ ছুটতেন সারা লণ্ডন শহর বা শহরতলীর সন্দেহমান জুতার দোকান বা উহার গ্রাহকদের সন্ধানে। এইরূপ ক্ষেত্রে বিলম্বের কারণে ঐ জুতা কোনও এক ক্রেতা ইতিমধ্যেই কিনে নিয়ে দেশের বিরাট জনসমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়ে থাকবে কিংবা 'বামাল-গ্রাহক'গণ উহা অন্য কোনও এক নিরাপদ স্থানে ত্বরিত গতিতে পাচার করে দিয়ে থাকবে। এছাড়া এই সকল সুচতুর ধনী বামাল-গ্রাহকগণের দিকে দিকে চর আছে এবং তারা চোখ কান খুলে রেখেই ব্যবসা চালায়। ইতিমধ্যে সংবাদ পেয়ে তাদের সাবধান হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এর পরও যদি কোন দোকান হতে মাত্র উহার বিবরণের সাহায্যে ঐ জুতা উদ্ধার করা সম্ভব হয়, তা'হলে উহা যে ফরিয়াদীর জুতা তা প্রমাণ

করা হবে এক সমস্যার বিষয়। কারণ, ঐরূপ জুতা বাজার সমূহে সকলের কাছেই নির্বিচারে বিক্রয় করা হয়। তখন পুলিশকে দেখতে হবে ঐ জুতার সুকতলায় ফরিয়াদীর পায়ের অনুরূপ চিহ্ন পড়েছে কি'না? অন্যথায় তারা ঐ জুতার তলদেশ-সংলগ্ন মৃত্তিকা চেঁছে বার করে রাসায়নিক পরীক্ষার পর প্রমাণ করতে চেষ্টা করবেন যে, ঐ মাটির কোমক্যালের সহিত ঘটনাস্থল বা ফরিয়াদীর গৃহ-প্রাঙ্গণের মাটির কেমিক্যালের সাদৃশ্য আছে। ফরিয়াদীর পায়ের একটি লোম দৈবক্রমে ঐ জুতার মধ্যে পাওয়া গেলেও হয়ত তাঁরা ঐরূপ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করবেন ঐ চুলটির দ্রব্যগুণ ফরিয়াদীর পায়ের অন্যান্য চুলের অনুরূপ। এই সম্পর্কে ফোরেন্সিক সায়েন্সের সাহায্যে ঐ জুতা জোড়াটির বর্ণচ্ছটার সহিত ফরিয়াদীর গৃহের অন্যান্য জুতা বা দ্রব্যের বর্ণচ্ছটার তুলনা করেও হয়ত তারা প্রমাণ করবেন যে, ঐ জুতা ঐ ফরিয়াদীরই। কোনও প্রকারে বিবিধ-বিজ্ঞানের সাহায্যে ঐ জুতাটি ফরিয়াদার অপহৃত দ্রব্যরূপে কথঞ্চিৎ প্রমাণ করার পর তাঁদের এইবার অবগত হতে হবে, ঐ জুতা অপরাধীমন্য ব্যক্তিদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি চুরি করে ঐ দোকানে বিক্রয় করেছে। অবশ্য ঐ জুতার কোনও স্থানে ভাগ্যক্রমে যদি তাদের কোনও একজনের আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়, তা'হলে সেকথা স্বতন্ত্র। তবে মসৃণ দ্রব্য নয় বলে ঐরূপ কোনও ছাপ না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিন্তু ঘর্ম-সিক্ত হস্তে জুতা ও কাগজ প্রভৃতি স্পর্শ করলে উহাতে আঙুলের ছাপ সন্নি-বেশিত হওয়াও অসম্ভব নয়। সাধারণত মনোবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে ঘটনার অব্যবহিত পরেই অপরাধী ধরা পড়লে তারা একটি স্বীকৃতি দিলেও দিতে পারে। কিন্তু বহুদিন বা বহুক্ষণ সময় অতিবাহিত হ'য়ে গেলে তাদের মনোবল অটুট হয় এবং তারা কোনও স্বীকৃতি প্রদান করে না। এইরূপ অবস্থায় দ্রব্যাদির চোর ও উহার গ্রাহক,

উভয়েই প্রায়শ ক্ষেত্রে অপরাধসমূহ অস্বীকার করে থাকে। এইরূপ অবস্থায় সোপর্দীকরণের পর বিচারের সময় ডিফেন্স হতে একটি মাত্র কথা বলা হয়, "হাঁ, একথা সত্য; জুতায় আসামীরই অঙ্গুলিটিপ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ঐ আসামী ঐ দিন সকালে হয়তো জুতা কিনতে গিয়ে ঐ জুতাটি সে পরীক্ষা করেছিল এবং সর্বশেষে পছন্দ না হওয়ার কারণে সে আর উহা কিনে নাই। ঐ সময়ই তার আঙ্গুলের ছাপ ঐ জুতায় থেকে যায় থাকবে।" ঐ জুতার গ্রাহকটিও সমধর্মীয় ব্যক্তি বিধায় অপরাধটিকে সমর্থন করে বলবে যে, তার ঐ উক্তি সর্বৈব সত্য, উপরন্তু আত্মপক্ষ সমর্থনে সে এ'ও বলবে যে, পূর্বদিন জনৈক অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তি ঐ জুতা তাকে বিক্রয় করেছে এবং দস্তুর মত খাতাপত্রে এই সম্পর্কে লিখে উচিত মূল্যে সে উহা ক্রয় করেছে। বহু দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার অভাবে এইরূপ জুতা বিক্রয় শহরে করে থাকে; সুতরাং সে এই বিষয়ে একান্তরূপে নির্দোষ।

এইরূপ অবস্থায় আদালতের বিচারে উভয় আসামীরই সন্দেহাতীত প্রমাণের অভাবে মুক্তি পাওয়াই স্বাভাবিক। এইবার এই বর্তমান য়ুরোপীয় এবং প্রাচীন ভারতীয় তদন্ত-পদ্ধতির এবং সোপর্দীকরণ-রীতির তুলনামূলক আলোচনা করলে বুঝা যাবে যে, ভারতীয় পুলিশ সরল, সহজ ও অকাট্য সাক্ষ্য প্রয়োগ করে এই উভয় আসামীর বিরুদ্ধেই মামলা প্রমাণ করতে সক্ষম। উপরোক্ত ভারতীয় তদন্তরীতি অনুধাবন করলে এই সত্যটি সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাবে। এই ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসার আদালতে সাক্ষ্য দিয়ে বলে থাকেন যে, আসামী তাঁর নিকট একটি বিবৃতি দেয় এবং ঐ বিবৃতি অনুযায়ী সে ঠিক যে স্থানটি হতে ঐ জুতা চুরি গিয়েছিল সেই স্থানটি তো সে দেখিয়ে দেয়ই, উপরন্তু সে তাকে

ঐ চীনাম্যানের দোকানেও নিয়ে গিয়েছিল এবং ঐ আসামীর বিবৃতি অনুযায়ী দু'জন স্থানীয় সাক্ষীর সম্মুখে সে ঐ দোকান হতে ঐ জুতা জোড়া উদ্ধার করতে পেরেছে। তদন্তকারী অফিসারের এই বিবৃতির সহিত ফরিয়াদীর এবং তৎসহ তল্লাসী-সাক্ষীদ্বয়ের বিবৃতির দ্বারা অপরাধীদের বিরুদ্ধে অপরাধ সহজে প্রমাণ করা গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে বিচারকের মনে মাত্র এই প্রশ্ন উঠবে যে, চোর নিজে ঐ দোকান না দেখিয়ে দিলে ঐ অপহৃত জুতা ফিরে পাওয়া অসম্ভব ছিল এবং চোর নিজে না চুরি করলে সঠিকভাবে ঘটনাস্থানটিই বা সে দেখিয়ে দিতে পারে কি করে? এবং চোর নিজে যখন ঐ দোকান ও ঐ দোকানীকে দেখিয়ে দিয়েছে, তা'হলে ঐ দোকানীও নিশ্চয় ঐ দ্রব্য তার নিকট হতে কিনেছে। এবং ঐরূপ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির নিকট ঐরূপ দামী য়ুরোপীয় জুতা যখন দোকানী কিনেছে তখন সে চোরাই দ্রব্যরূপেই তা তার নিকট হতে কিনেছে। এইভাবে আমরা আরও দেখতে পাবো যে ভারতীয় পুলিশ সাক্ষ্য পর্যন্ত নিজস্ব পন্থায় মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের ভিত্তিতে পরিবেশন করতে সক্ষম। এইস্থলে আমরা দেখতে পাবো যে, য়ুরোপীয় পুলিশ কামান বন্দুকের সাহায্যে যে সাফল্য অর্জন করেন, ভারতীয় পুলিশ তার চেয়েও অধিক সাফল্য লাভ করে থাকেন রিক্তহস্তে। তাই আজও প্রবীণ ভারতীয় পুলিশরা য়ুরোপীয় পুলিশদের কার্য-পদ্ধতিকে উপহাস করে বলে থাকেন যে, তাদের কার্যসমূহ 'মশা মারতে কামান দাগা'র সমপর্যায়ে পড়ে। এইরূপ সাফল্যের সম্পর্কে যদি কেহ চান্সের কথা তুলেন তা'হলে আমি বলব যে, উভয় পদ্ধতিতেই চান্সের ভাগ থাকে প্রায়ই সমান। তবে একথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে যে ভারতীয় তদন্তরীতি অতি সরল এবং য়ুরোপীয় তদন্তরীতি অতীব বক্র

এবং উহা সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। যে সাফল্য ভারতীয় পুলিশ তদন্তের সারল্যের কারণে বিনামূল্যে অর্জন করে, সেই সাফল্য য়ুরোপীয় পুলিশকে অর্জন করতে হয় বহু রাষ্ট্রীয় মুদ্রার বিনিময়ে। যাঁরা অভিযোগ করেন যে, ভারতীয় পুলিশ আসামী বা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিবৃতির উপর যত নির্ভরশীল তত নির্ভরশীল তারা অপরাধ সম্পর্কীয় সূত্রের উপর নয়—তাঁদের সময় ও অর্থের এইরূপ অযথা অপচয়ের দিকটাও ভেবে দেখতে আমি অনুরোধ করি। ভারতীয় আদালত সমূহে প্রায়ই দেখা যায় যে, অপরাধীর স্বীকারোক্তির ফলেই মামলা বিশেষের কিনারা করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ইচ্ছা করে কি কেউ নিজের মৃত্যুবাণ নিজে বাতলে দেয়, ভারতীয় পুলিশ তাদের মধ্যে অনুতাপ ও অনুশোচনা ও ধর্ম ভাবের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় বলেই তা তারা করে। এইক্ষেত্রে ভারতীয় পুলিশ শুধু তাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণ করেন না, তাদের মধ্যে নীতি ও ধর্মবোধ এনে তাদের শুধরেও দিয়ে থাকেন। তবে আইনের দাস তাঁরা, তাই আদালতে এদের পেশ করতে তাঁরা বাধ্য। এর পর যদি আদালত তাদের শোধরাবার সুযোগ না দিয়ে জেলে পাঠায় তা'হলে ঔচিত্য বা অনৌচিত্যের যা কিছু দায়িত্ব তা রাষ্ট্রের (ব্রিটিশ প্রবর্তিত) আইন সভার। কারণ য়ুরোপের ন্যায় ভারতীয় আদালতসমূহও বাঁধাধরা আইনের দাস মাত্র; কিন্তু প্রাগ্‌ব্রিটিশ ভারতীয় গ্রাম্য পঞ্চায়েত ও অন্যান্য আদালতসমূহ এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ব্যবস্থাই আবহমানকাল হতে করে এসেছেন। এ সম্পর্কে স্বীকার করতে বাধা নেই যে, ভারতীয় পুলিশ অন্তত এই একটি বিষয়ে (তাঁদের ব্রিটিশ শাসকদের অজ্ঞাতেই) প্রাচীন ভারতীয় রক্ষীবর্গের ঐতিহ্য, সংস্কার ও সংস্কৃতির অধিকারী। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তি-বিশেষের মাধ্যমে এসে উহা

বিকৃতরূপে প্রকাশ পেলেও অধিকাংশ ভারতীয় পুলিশই অপরাধীদের প্রতি অতীব সহানুভূতিশীলতার পরিচয় দিয়ে থাকেন।

এইবার ভারতীয় পুলিশ-সুলভ অতীব সহজ তদন্ত-প্রণালী অনুযায়ী কিরূপে অপর একটি দুরূহ মামলার কিনারা করা সম্ভব হয়েছিল তা নিয়ে বিবৃত করা হল। ঘটনাটি ভারতীয় পুলিশের অসীম ধৈর্য, বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিচায়ক।

"কোনও এক জজ্ সাহেবের বাড়ি হতে তাঁর এক পুত্রবধূর মূল্যবান স্বর্ণ-হার চুরি যায়। আমাকে বিশেষ করে এই মামলার তদন্তে পাঠানো হয়েছিল। আমি জজ্ সাহেব মহাশয়ের বাটীতে এলে তিনি সাদরে আমাদের তাঁর উপরের বৈঠকখানায় বসিয়ে জানালেন, 'এ মশাই পাকা পেশাদারী বাইরের চোরেরই কাজ। কি আশ্চর্য, আমার মত লোকের বাড়িতেও দিনে দুপুরে চুরি! তা দেখুন, কি করতে পারেন। বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্, এ তো এক ভীষণ কাণ্ড।' জজ্ সাহেব আরও হয়ত অনেক কথা আমাদের শুনাতেন কিন্তু ইত্যবসরে পাশের ঘর থেকে খবর এলো যে তাঁকে টেলিফোনে কে ডাকছে। তিনি চলে গেলে আমি ও আমার সহকারী নিম্নস্বরে এই চুরি সম্পর্কে কথাবার্তা বলছিলাম, এমন সময় আমাদের লক্ষ্য পড়লো একটি উড়িয়া চাকরের দিকে। সে দুয়ারের এপারের বারান্দার ধারে ঘর ধোয়ার অছিলায় জল শুদ্ধ বালতি হাতে দুয়ারের ফাঁক দিয়ে আমাদের বারে বারে দেখে যাচ্ছিল। আমি এই দেখে নিম্নস্বরে আমার সহকারীকে জানালাম, ঐ লোকটাকে তো সুবিধের মনে হচ্ছে না, দাঁড়াও দেখি। এর পর ঐ উড়িয়া চাকরটিকে কাছে ডেকে আমি বললাম, 'আয়, এদিকে আয়। তুই অত ভয় পাচ্ছিস কেন? এ্যাঁ? তোকে তো আমরা ধরতে আসি নি। বোস্ বোস্, এইখানে বোস্। হ্যাঁরে, তোর দেশ কোথায়,

আছে কে কে তোর সেখানে?' আমতা আমতা করে ভৃত্যটি জানা'লা যে তার দেশ কটক জিলার অমুক গ্রামে। দেশে তার নাবালিকা স্ত্রী ও একটি শিশুকে সে রেখে এসেছে। তার স্ত্রী ও শিশু পুত্রের কথা শুনে আঁতকে উঠে আমি বলে উঠলাম, 'এঁ্যা বলিস কি রে? বাড়িতে তোর সেই বালিকা বধূ ও ঐ এক রত্তি পুত্র আছে, আব তুই এমন একটা কাজ করে বস্‌লি! আহা আহা, তাই তো, কি করা যায় বল দিকি এখন। তা তো'কে তা'হলে তো একরকম করে বাঁচিয়ে দিতেই হবে। তোকে তো বাপু দেখলে ভালো লোকই মনে হয়, তা তুই—' এইরূপ আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পব ভৃত্যটি এমন একটি পরিস্থিতিতে এসে পড়লো যে সে অপরাধ স্বীকার করে আমার পা জড়িয়ে ধরে বারে বারে তাকে বাঁচিয়ে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে থাকলো। ঠিক এই সময় জজ্ সাহেব সেইখানে এসে পড়ে তাঁর ঐ ভৃত্যটিকে ঐ অবস্থায় দেখে আমাদের অনুযোগ করে বললেন, 'আরে মশাই, আপনারা আবার ওকে নিয়ে পড়লেন কেন? ও'লোক খুবই ভালো, ওকে ছেড়ে দিন। ওর উপর আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। যা রে, ভজু, যা, বাড়ির ভিতরে কাজ করগে যা।' উত্তরে আমি জজ্ সাহেবকে বললাম, 'না, ও কিছু জানে না। তবে ও একটা লোকের ঠিকানা জানে, তার বাড়িটা শুধু দেখিয়ে দেবে। এক্ষুনি ওকে নিয়ে আমরা আবার এখানেই ফিরে আসছি।' এর পর আর জজ্ সাহেবকে কোনও প্রতিবাদ করবার অবসর না দিয়েই আমরা ঐ উড়িয়া ভৃত্যকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এর পর ঐ ভৃত্যটি আমাদের চিৎপুর রোডে এনে সেখানকার এক সারি পোদ্দারের দোকানের মধ্যে একটি অর্গল বন্ধ দোকান দুর হতে দেখিয়ে বললে, যে, সে

ঐ স্বর্ণ-হারটি চুরি করে এনে ঐ দিনই ঐ দোকানে একশত টাকা মূল্যে তা বিক্রয় করেছে এবং সে ঐ দিনই বিক্রয় লব্ধ একশত টাকা স্ত্রীপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন ও তাদের ভগ্নপ্রায় কুটির মেরামত করার জন্যে দেশের ঠিকানায় মনি অর্ডার করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, আমরা সকলেই বেউর্নীতে' তদন্তরত ছিলাম। আমি সহকারীর জিম্মায় উড়িয়া ভৃত্যটিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সাধারণ নাগরিকের বেশে পার্শ্ববর্তী দোকানের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আজ্ঞে মশাই, এই দোকান তো বন্ধ দেখছি, কিন্তু এর মালিকের বাসার ঠিকানা বলতে পারেন?' এই সব কয়টি দোকানীই ছিল এক দলেরই দলী, তাদের ব্যবসাই হচ্ছে চোরাই গহনা কিনে ত্বরিত গতিতে তা গালিয়ে ফেলা। এই কারণে এই স্থানের কোনও দোকানীই—ঐ ভদ্রলোকের ঠিকানাটা জেনেও তা বলতে চাচ্ছে না বুঝে আমি ব্যস্ততার সঙ্গে বলে উঠলাম, 'এই তো মুস্কিলে পড়া গেলো মশাই। ভদ্রলোকের মাতাঠাকরুণ ওঁর স্বগ্রামে মারা গেছেন। আমি তাঁর সেই গ্রাম থেকেই তাঁকে খবর দিতে এসেছি।'—'ওঃ তাই নাকি?'—এই কথা শুনে এঁদের একজন বলে উঠলেন, 'চলে যান শিগ্‌গির তা'হলে। ওঁর ঠিকানা হচ্ছে অমুক লেনের অত নম্বর বাড়ি।' এই কথা শুনা মাত্র আমরা ত্বরিত গতিতে ভদ্রলোকের ঐ ঠিকানায় এসে তাঁর নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করে দিলাম। কিন্তু সেই ভদ্রলোকও ছিলেন একজন অত্যন্ত চালাক ব্যক্তি। সহসা তাঁর নাম ধরে ডাকায় বোধ হয় তিনি সন্দেহই করে থাকবেন। ওদিকে ঐ বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটিয়ারাও আমাদের বিশেষ আমল দিতে চান না বলেই মনে হল। অতগুলো ঘরের এক-একটিতে এক-একটি পরিবার বাস করে। কোন্ ঘরটিতে যে ঐ ভদ্রলোক থাকেন তা প্রথমে খুঁজে

বার করা দরকার। এদিকে আমাদের খোঁজা-খুঁজির বহর দেখে ভদ্রলোকটিও হয়ত গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়তে পারেন। আমি তখন আর অপেক্ষা না করে ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আরে মশাইরা দাঁড়িয়ে দেখছেন কি? শীগ্‌গির অমুক বাবুকে ডেকে দিন। আমি চীৎপুর রোড থেকে আসছি, তাঁর দোকানে আগুন লেগেছে।' আগুন লাগার বার্তা কানে যাওয়া মাত্র ভদ্রলোকটি কোণের একটি ঘর থেকে নগ্ন পদ ও গাত্রেই বেরিয়ে পড়ে বলে উঠলেন, 'এঁ্যা, কি বললেন, আগুন লেগেছে?' বলা বাহুল্য তিনি আঁৎকে উঠে বেরিয়ে আসা মাত্র আমরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে বলে উঠলাম, 'আজ্ঞে না, আমরা পুলিশ। দেখুন তো, চেনেন কিনা ঐ উড়িয়া ভৃত্যটিকে?' এরপর ভদ্রলোকটিকে একজন পশ্চাদাগত সিপাহীর জিম্মা করে দিয়ে ভদ্রলোকের কক্ষে ঢুকে তাঁর স্ত্রীকে বললাম, 'আজ্ঞে, ভয়ের কিছু নেই। ঐ চোরটা এসব কিছু না জানিয়েই একটা গহনা এঁকে বিক্রি করে গিয়েছে। গহনাটা আপনি আপনার আলমারি থেকে বার করে দিন, তা'হলেই যা কিছু গণ্ডগোল তা চুকে যাবে।' এরপর আরও একটু বুঝিয়ে বলাতে ভদ্রলোকের স্ত্রী গহনাটি তাঁর আলমারি থেকে বার করে এনে আমাদের হাতে ঐ বাটীরই দুইজন সাক্ষীর সামনে তুলে দিয়েছিলেন।"

এইখানে ভারতীয় পুলিশদের মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞানসহ সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কীয় জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় পুলিশ জানে, প্রথমেই অপরাধীমনস্ক ব্যক্তিকে তার অপরাধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে কোনও ফল হয় না। তার সহিত অপরাধের সম্পর্ক রহিত কথাবার্তা প্রথমে বলা দরকার। এইরূপ কথাবার্তার মধ্যে তার মানসিক দুর্বলতা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার পর তার চিত্তপ্রস্তুতি (Predisposition) অনুযায়ী তার প্রতি

প্রয়োজনীয় বাক্যবিন্যাস প্রয়োগ করলে তবেই সে তার এক দুর্বল মুহূর্তে অপরাধ-সম্পর্কীয় এক স্বীকৃতি প্রদান করবে। এ'ছাড়া ভারতীয় পুলিশ ইহাও অবগত আছে যে, ভারতীয় সমাজে কোনও কোনও পুরুষরা অপরাধ-প্রবণ হলেও তাদের স্ত্রীরা প্রায়শ ক্ষেত্রে অপরাধীকে ঘৃণাই করে এসেছে। এইজন্য এক শ্রেণীর অভ্যাস অপরাধীবা তাদেব আপন আপন স্ত্রীর অজ্ঞাতেই অপকর্ম করে থাকে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে অপরাধীটির স্ত্রী সবল বিশ্বাসে এই ভাবে পুলিশকে সাহায্য করেছিল। অপরাধীটি তার স্ত্রীকে যথাসময়ে সাবধান করে দিতে পারলে অবশ্য সে এইরূপ সাহায্য পুলিশকে করত না। কারণ একজন ভারতীয় স্ত্রী স্বামীর জীবন ও মান রক্ষার জন্য যে কোনও কার্য করতে প্রস্তুত। ইহাও ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞানের একটি বিশেষ দিক। এই কারণে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সহিত ঐ রক্ষীপুঙ্গব তাঁর স্বামীকে অগ্রেই তাঁর স্ত্রীর সন্নিধান হতে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এইভাবে আমরা দেখতে পাবো-যে, যে রীতিতে ইংলস্থানীয় পুলিশ তদন্ত করে সেই রীতিতে ভারতে তদন্ত কার্য করা হয় নি। ইহার কারণ সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমি বলেছি। এইজন্য ভারতীয় পুলিশকে অপরাধী ও তাহাদের গোষ্ঠীয়দের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি তো জানতে হয়েছেই, উপরন্তু ভারতীয় নিরপরাধ সভ্য সমাজেরও রীতিনীতি সম্বন্ধে তাদের অবহিত হ'তে হয়েছে। কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়া মাত্র তদন্ত-কার্য শুরু হলে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পন্থাসমূহ যে বিশেষ কার্যকরী তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন বহু অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যার খবর পুলিশের কাছে ছয়মাসের পর কিংবা এক বৎসর পরে পৌঁছিয়েছে। এইক্ষেত্রে এমন কোনও সূত্রের সন্ধান প্রায়ই পাওয়া যায় নি যার উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চলতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে ভারতীয় পুলিশের

নিজস্ব তদন্তরীতিরই প্রয়োজন সর্বাধিক। তবে ভারতীয় পুলিশ বৈজ্ঞানিক পন্থাসমূহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল না হলেও প্রয়োজন মত তারা সকল ক্ষেত্রেই তদন্ত-কার্যে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পদ-চিহ্ন শাস্ত্র এই দেশেরই প্রচীন বংশানুগত ডিটেকটিভগণ কর্তৃক সৃষ্ট। আঙ্গুলের টিপ-চিহ্ন শাস্ত্রও সর্বপ্রথম এই দেশে সৃষ্ট হয়ে এই দেশেই সর্বপ্রথম চালু করা হয়। বঙ্গীয় ফিঙ্গার প্রিণ্ট ব্যুরো পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ব্যুরো। উক্ত বিজ্ঞানদ্বয় সহ, অপপদ্ধতি বিজ্ঞান, ফোরেন্সিক শাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন অপরাধ-তদন্ত সম্পর্কীয় আধুনিক বিজ্ঞান সমূহের সাহায্য অধুনাকালে য়ুরোপীয় পুলিশের ন্যায় ভারতীয় পুলিশও গ্রহণ করে থাকে। তবে তাদের এই সকল শাস্ত্রকে ভারতের উপযোগী করে ঢেলে সাজিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় পুলিশ তদন্ত-কার্যে নিজেদের মূল পদ্ধতি আজও ত্যাগ করে নি। আমি এই পুস্তকে যে সকল বিখ্যাত মামলার তদন্ত ও উহাদের বিচারের কাহিনী বিবৃত করবো তাহাদের প্রায় সব কয়টির তদন্ত, অধিক ক্ষেত্রেই ভারতীয় নিজস্ব তদন্ত-পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। ঐ সকল তদন্তের সাফল্যের জন্য যা কিছু প্রশংসা তাহা ভারতীয় পুলিশের নিজস্ব তদন্তরীতিরই প্রাপ্য।

এখন হয়ত কেহ প্রশ্ন করবেন যে, এইরূপ তদন্তরীতিতে সকল ক্ষেত্রেই সুফল ফলে কি না। এর উত্তরে প্রত্যেক ভারতীয় পুলিশ বলবেন যে, কৃতকার্যতার প্রশ্ন এখানে উঠে না। এখানে শতকরা কতগুলি মামলার কিনারা তাঁরা তাঁদের এই নিজস্ব পন্থায় করতে পেরেছেন তাই তাঁরা দেখে থাকেন। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে ফলাফলের কথা না ভেবে কেবল মাত্র তাঁরা তাঁদের প্রতিটি করণীয় কার্য সুষ্ঠুরূপে করে যান। তবে এ কথাও সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের পরিশ্রম সফলই হয়ে থাকে।

পাগলা হত্যা মামলা

যে সকল মামলা কলিকাতা তথা ভারতীয় পুলিশের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে, "পাগলা মার্ডার কেস" বা "পাগলা হত্যার মামলা" উহাদের মধ্যে অন্যতম। এই মামলাটি সম্পূর্ণরূপেই পরিবেশিক প্রমাণের উপর নির্ভর করে আদালতে সোপর্দীকৃত হয়। মানুষ মিথ্যা কথা বললেও, পরিবেশ মিথ্যা বলে না। তাই এই হত্যাকাণ্ডটির কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকলেও এই মামলার একজন আসামীর প্রাণদণ্ড এবং দুইজন আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর সম্ভব হয়েছিল। এই থেকে বুঝা যাবে কিরূপ ধৈর্য ও চাতুর্যের সহিত এই মামলা তদন্ত ও সোপর্দীকৃত হয়েছিল। এই মামলার তদন্ত সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় পদ্ধতিতে সমাধা করা হলেও এই তদন্তরীতি পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়, তাই মহাধর্মাধিকরণ জাস্টিস খোন্দকার সাহেব হাইকোর্টের সেসন কোর্টে উহার রায়-দান প্রসঙ্গে এই সুললিত তদন্তকে 'পুলিশি তদন্তের জয়যাত্রা' রূপে অভিহিত করেছিলেন।

এই মামলা সম্পর্কিত ঘটনা ও উহার তদন্ত জনসাধারণের মনকে কম আলোড়িত করে নি। কারণ এই মহাতদন্তে পুলিশের ন্যায় জনসাধারণেরও বহু ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেছিল। ঐ ঘটনার পর বহু বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ঐ হতভাগ্য নিহত ব্যক্তি ও উহার হত্যাকারীর বিষয় জনসাধারণ আজও ভুলে নি। উত্তর কলিকাতার গৃহে গৃহে ঘটনাটি আজও আলোচিত হয়ে থাকে। এই ঘটনার নায়িকা ছিল এই শহরের এক অপূর্ব সুন্দরী নারী।

এই নারীর অদম্য ভালবাসা একাধারে নিহত ব্যক্তি ও তাহার হত্যাকারীর উপর পড়ে। ইহাই ছিল এই অভাবনীয় ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ। তাই বহু বৎসর ধ'রে বহু সাহিত্যিকও ঐ ঘটনাটির সদ্‌ব্যবহার করেছেন। উপরন্তু এই মামলার তদন্তে পুলিশ বিশেষরূপে জনসাধারণের সক্রিয় সাহায্যলাভ করেছিল। তাই মামলাটিকে এই সম্পর্কে আজ পর্যন্ত একটি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হয়।

এইবার মূল ঘটনা সম্বন্ধে বিবৃত করা যাক। এই সময় আমি শ্যামপুকুর থানায় একজন অফিসাররূপে কর্মরত ছিলাম। ঐ দিন তারিখ ছিল ১৯৩৬ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। সকাল আটটার সময় আমরা থানার অফিস ঘরগুলিতে নিজ নিজ কাজকর্মে মনোনিবেশ করছি এমন সময় কলিকাতা করপোরেশনের ওভারসিয়ার বাবু বিনয়কুমার রায় হন্তদন্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পূর্ব হতেই পরিচয় ছিল। বিস্মিত হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আরে ব্যাপার কি মশাই? আপনার আবার কি হল?" ভদ্রলোক নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা বলতে আসেন নি। তিনি চোখদুটি বড় বড় করে বলে উঠলেন, "সাংঘাতিক কাণ্ড মশাই, জীবনে এ আমি দেখিনি। মুণ্ডুটা পর্যন্ত কেটে নিয়েছে।" এক সঙ্গে আমাদের সব কজনেরই হাতের কলম থেমে গেল। ঘটনাটি তাঁর নিকট শুনা মাত্র আমি হাবিলদারকে একজন জমাদার ও দশজন কনস্টেবল তৈরি করবার জন্য আদেশ দিয়ে, ত্বরিত গতিতে সংবাদ বহিতে প্রাথমিক সংবাদরূপে তাঁর নিম্নোক্ত বিবৃতিটি লিখে নিলাম।

"আমি একজন করপোরেশনের ওভারশিয়ার। সকাল ছয়টার সময় আমি প্রতিদিনের মত এই দিনও মেথরদের কাজের খবরদারী করতে বার হই। ঘুরতে ঘুরতে আমি বলরাম মজুমদার স্ট্রিটে

এসেছি, এমন সময় আমাদের ঝাড়ুদার মোহন সম্মুখের মেথর গলি হতে ছুটে বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, 'বাবু বাবু, ভিতরে একটা মুণ্ডুকাটা লাস পড়ে রয়েছে।' আমি সাহস করে ঐ গলির ভিতর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখি একটি মুণ্ডহীন দেহ দেওয়ালের ভিতর একটি গর্তে ঢুকানো রয়েছে। এর পর আমি মোহনকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে আপনাদের খবর দিবার জন্য ছুটতে ছুটতে থানায় এসেছি।"

উপরিউক্ত প্রাথমিক সংবাদটি থানায় নথিভুক্ত করে আমি ইনেস্‌পেক্টর সুনীল রায় এবং অন্যান্য অফিসারদের সহিত ত্বরিত গতিতে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হলাম। কোনও গুরুতর অপরাধের তদন্তে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন যথাসত্বর ঘটনাস্থলে গমন, তা না হলে বিলম্বের কারণে বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্ট বা অন্তর্হিত হয়ে যায়। ঐ সময় অধুনাকালের ন্যায় থানায় থানায় যন্ত্রশকট দেওয়া ছিল না। এইজন্য নিজ খরচায় ট্যাক্সি করেই আমরা ঘটনাস্থলে গমন করি। তা'ছাড়া অধিক অফিসার সঙ্গে নেওয়ার একটি কারণও ছিল। কারণ, ঘটনাস্থলে এমন অনেক সংবাদ পাওয়া যেতে পারে, যার জন্য এক একজন অফিসারকে এক একদিকে বিদ্যুৎগতিতে পাঠানোর দরকার হতে পারে। এইজন্য সদল বলে মাত্র পাঁচ বা ছয় মিনিটের মধ্যেই আমরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছিয়েছিলাম।

ঘটনাস্থলটি ছিল একটি অপরিসর মেথর গলিতে। এই অখ্যাত (পরে প্রখ্যাত) গলিটি কুমারটুলি অঞ্চলের বলরাম মজুমদার স্ট্রিট হতে নির্গত হয়ে দুইসারি বৃহৎ দ্বিতল ও ত্রিতল অট্টালিকার পশ্চাদ্‌-ভাগের মধ্য দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এর অপর মুখটি ধ'রে কিছুটা দূর এগিয়ে গেলে শোভাবাজার স্ট্রিট পর্যন্ত অনায়াসে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ঐ সকল বাটীর পশ্চাদ্‌-ভাগে 'এমন একটিও দরজা ছিল না, যেখান দিয়ে কেহ এই গলিতে

বেরিয়ে আসতে পারে। বস্তুতপক্ষে এক করপোরেশনের মেথর ও ঝাড়ুদার ছাড়া এই মেথর গলি বা সুআড´-ড্রিচ্ অপর আর কারও দ্বারা ব্যবহৃত হবার কথা নয়।

এই মেথর গলিটা দিয়ে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়ে আমার মনে হল যে এই গলিটার সহিত একমাত্র সিঁদেল চোরগণ ব্যতীত আর কারও পরিচয় থাকবার কথা নয়। এইজন্য যেতে যেতেই আমি ইনেসপেক্টর রায়কে বললাম, 'দেখুন, আমার মনে হয় হত্যাকারী একজন সিঁদেল চোর বা ডাকাতও বটে।' বিস্মিত হয়ে আমাকে সুনীল বাবু বললেন, 'একি বলছো তুমি? যে সিঁদেল চোর সে তো খুনে ডাকাত কখনও হয় না। এই সম্পর্কে বিলাতী বইগুলো তো অন্য রকম বলে।' এ সম্বন্ধে কয়েকটি বিলাতী কেতাব আমারও পড়া ছিল। কিন্তু তাদের সহিত সবকয়টি বিষয়ে আমি একমত হতে পারি নি। কারণ ঐ সম্বন্ধে আমার নিজেরও অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। তাই উত্তরে আমি বললাম, 'দেখুন সিঁদেল চোর, ডাকাত ও খুনে আমার মতে এক শ্রেণীরই তিনটি উপশ্রেণী, কারণ এরা সকলেই বস্তু কিংবা ব্যক্তির উপর বলপ্রকাশ করে থাকে। এইজন্য যে সিঁদেল চোর সে খুনও করতে সক্ষম। তালাতোড়রা নিষ্প্রয়োজনে আঘাত না হানলেও প্রয়োজন হলে আঘাত হানে। এইজন্য উহাদের মধ্যবর্তী অপরাধী বলা হয়ে থাকে। ডাকাতরা একধারে দরজা, জানলা বা দেওয়াল ভেঙে সম্পত্তি অপহরণ করে এবং প্রয়োজন হলে ভয় দেখায় বা খুনও করে। তবে একজন নির্বল চোর, অর্থাৎ যে কোনও বস্তু কিংবা ব্যক্তি, কারও উপর কোনও অবস্থাতেই বলপ্রকাশ করে না, সে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন শ্রেণীর অপরাধী। এইজন্য এরা কখনও হত্যাকার্য করবে না। এই কারণে আমার মনে হয় যে, এমন ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ড করেছে, যে এই অঞ্চলে

সবল বা সিঁদেল চোরের কার্যের জন্য এই গলিটি পূর্বে ব্যবহার করেছে।'

এইভাবে কথোপকথনের মধ্যে আমরা মূল ঘটনাস্থলে এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গলির তলদেশ হতে প্রায় চারিফুট উর্ধে একটি বাটীর পিছনের দেওয়ালের ভিতরকার একটা গর্তে উপুড় অবস্থায় একটা মুণ্ডহীন দেহ রাখা রয়েছে। মস্তকটি বেশ যত্ন-সহকারে স্কন্ধদেশ ঘেঁসে পেঁচিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে। ঐ মৃতদেহের নিম্নে কোনও রক্ত দেখা না গেলেও উহা হতে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে দুইটি রক্তের চাপড়া দেখা যায়। সতর্ক দৃষ্টির সাহায্যে আমরা ঐ স্থানের বাটীর দেওয়ালেও রক্তের ফোঁটা দেখতে পেলাম। বেশ বুঝা গেল এইস্থানেই ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় এবং তার ফলে রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে উঠে দেওয়ালের গায়ে লাগে। এরপর এই মৃতদেহটিকে ধরাধরি করে তুলে ঐ গর্তের মধ্যে ঘুসটে রাখা হয়। কিন্তু এই ভারি মৃতদেহটি অত উপরে তুলে রাখার জন্য একাধিক লোকের প্রয়োজন। এইজন্য আমরা ঐ সময়েই বুঝে নিই যে, হত্যাকারী একজন নয়, তারা নিশ্চয় দুই, তিন বা ততোধিক ব্যক্তি।

এইবার কেহ কেহ ঐ দেহটি নীচে নামিয়ে পরীক্ষা করতে চাইলেন। কিন্তু আমি ও সুনীল বাবু এই সম্বন্ধে একমত হতে পারলাম না। এইজন্য আমরা ফটোগ্রাফার, প্ল্যানমেকার ও ফিঙ্গার ও ফুট প্রিণ্ট এক্সপার্টের জন্যে অপেক্ষা করা সমুচিত মনে করলাম। বলা বাহুল্য, আমরা ঘটনাস্থলে রওনা হবার পূর্বেই এই তিন ব্যক্তিকে সোজা ঘটনাস্থলে আসবার জন্য ফোনে বলে দিয়েছিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঐ এক্সপার্টত্রয় অকুস্থলে উপস্থিত হলে আমরা প্রথমেই ঐ গর্তসহ মৃত দেহটির একটি

আলোকচিত্র তুলবার বন্দোবস্ত করলাম। কারণ তা না হলে জজ ও জুরিগণ প্রয়োজনবোধে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে হয়ত আপন আপন ধ্যান ধারণা বশত বলে বসতেন যে ঐ অপরিসর গর্তে অতবড় একটি দেহ প্রবেশ করিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। আমার বেশ মনে পড়ে, এই সম্পর্কে আমার সহকারীদের ঐ সময় আমি বলেছিলাম, 'আমাদের প্রতিটি সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে তাদের কথা ভেবে যাদের কাছে শেষ বিচারের ভার আছে। তা না হলে আমাদের সকল পরিশ্রম একদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। এইখানে ফটোতোলা কার্যের পর ঐ গর্ত, মৃতদেহ, অদূরস্থ রক্তের চাপ এবং দুইপার্শ্বের বাটীগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ঐ গলিটির আরও দুই তিনটি ফটোও আমরা উঠিয়ে নিলাম। এরপর প্ল্যানমেকার এসে উপরোক্ত প্রতিটি পদার্থের পারস্পরিক দূরত্ব দেখিয়ে অতি সাবধানে ঐ গলির পরিধি ও দৈর্ঘ্যের মাপ সহ ঐ গর্তেরও একটি প্ল্যান এঁকে নিলেন। এ'ছাড়া সমধিক আলোকের অভাবে ফটো তোলার অসুবিধা হওযায় আমরা কুমারটুলির বিখ্যাত শিল্পী গোপেশ্বর পাল ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মণি পাল মহোদয়দের ডাকিয়ে এনে ঐ গর্ত ও গলিটির একটি প্রাণবন্ত পেন্‌সিল স্কেচও তাঁদের দ্বারা আঁকিয়ে নিই। এই দুই ভদ্রলোক সানন্দেই বিনা পারিশ্রামিকে এই বিষয়ে আমাদের সাহায্য করেছিলেন। এর পর সাবধানে আমরা ঐ মৃতদেহটিকে নামিয়ে এনে উহা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে থাকি। আমরা প্রথমে রক্তের চাপের উপর বা অন্যকোনও স্থানে কোনও ফিঙ্গার বা ফুট প্রিণ্ট পড়েছে কিনা তা খুঁজতে চেষ্টা করি; কিন্তু কোথাও ঐরূপ একটি টিপচিহ্ন আমরা পাই নি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মত প্রকাশ করেন যে, হয়ত কোন বাড়িতে হত্যাকাণ্ড করে মাথায় করে কিংবা শকটে তুলে দেহটি

ঘটনাস্থলে আনা হয়েছে। কিন্তু যদিও দেওয়ালে রক্তের ফোঁটা সন্নিবেশিত থাকায় ঘটনাস্থল সম্বন্ধে আমরা দ্বিমত ছিলাম না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঐ গলির বাইরের রাস্তার উপর আমরা শকটাদির চাকার চিহ্ন আবিষ্কার করতেও চেষ্টা করি; কিন্তু কোথাও ঐরূপ কোনও চিহ্ন আমরা খুঁজে পেলাম না। এর পরে দেহটিকে উল্টে পাল্টে পরীক্ষা করে দেখতে পাই যে, উহার বক্ষে দুইটি গভীর ক্ষত আছে এবং তদুপরি উহার উভয় পায়ের টেণ্ডন বা শিরাও কেটে দেওয়া হয়েছে। দেহটি পুরাপুরি নগ্ন থাকলেও তলদেশ হতে আমরা একটি রক্ত-সিক্ত গেঞ্জি ও একটি পৈতা আবিষ্কার করি।

এই মামলা প্রমাণ করতে হলে প্রথমে আমাদের বার করতে হবে এই নিহত ব্যক্তিটি কে? নিহত ব্যক্তিটির নাম ধাম ও পরিচয় বার না করতে পারলে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা তো শক্ত হবেই উপরন্তু এই মামলাটিও সম্যকরূপে প্রমাণ করা যাবে না। এক্ষণে মৃতের দেহাবয়বের ও উহার সন্নিকটে প্রাপ্ত পৈতাটি পরিলক্ষ্য করে আমরা মাত্র এইটুকু বুঝতে পারলাম যে, লোকটি একজন ২৭ বা ২৮ বৎসরের দেশীয় ব্রাহ্মণ যুবক, কিন্তু সে একজন দেশবালী, মাদ্রাজী, উড়িয়া কি বাঙ্গালী তা বুঝা গেল না। এখন আমাদের প্রথম সমস্যা হল মৃত ব্যক্তির পরিচয় বার করা। এই উদ্দেশ্যে আমরা মৃতদেহের পায়ের ও অঙ্গুলির ছাপ-গুলি সযত্নে সংগ্রহ করতে থাকি। কারণ বহু ক্ষেত্রে যারা নিহত হয় তারাও সৎ ব্যক্তি থাকে না। এদের কেহ কেহ বিবিধ অপরাধ করায় তাদের অঙ্গুলি ও পদচিহ্ন গৃহীত হয়ে পুলিশি দপ্তরে রক্ষিত থাকে। অনেক সময় প্রকৃত অপরাধী না হলেও এরা মাতলামী, গোলমাল বা মারপিট করার অপরাধে থানা সমূহে ধৃত

কুমারটুলির মেথর-গলি—হত্যাস্থল

মুণ্ডহীন দেহ

হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে এদের জামিনের কাগজে এদের সহির বদলে টিপসহি পাওয়া গেলেও যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত কোনও দলিল প্রভৃতিতে এদের দস্তখতের বদলে আঙ্গুলের টিপ পাওয়া অসম্ভব নয়। যেহেতু দেহ পুড়িয়ে ফেলার পর ঐ সকল চিহ্ন পবে প্রয়োজন হলে আর আমরা পাবো না, সেই হেতু আমব পূর্বাহ্ণেই ঐগুলি সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। অনেক সময় নিহত ব্যক্তিদের পদ-চিহ্ন তাদের ব্যবহৃত জুতার সুখতলাতেও সন্নিবেশিত হয়ে থাকে। পরে যদি আমরা ঐ নিহত ব্যক্তির এক জোড়া জুতা আবিষ্কার করতে পারি, তা'হলেও ঐ সুখতলার উপর অঙ্কিত পদচিহ্নের সহিত এই মৃতের পদ হতে সংগৃহীত চিহ্নের তুলনা করে বলে দিতে পারবো যে, ঐ মৃত ব্যক্তিটিই ছিল জুতার অধিকারী। এর পর ইনেস্‌পেক্টর রায় দেহটি আরও পরিদর্শন করে দেখলেন যে, মৃত ব্যক্তির একটি পা কুশ-পা, এবং উহার বাম বাহুর উপর একটি ফুলের উল্কিচিহ্নও আছে। এ'ছাড়া আমরা মৃত-দেহের বক্ষে ও বাহুতে প্রচুর লোম দেখতে পেলাম। কিন্তু এই-খানেই আমরা ক্ষান্ত হই নি। আমরা মৃত দেহের ওজন ও দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের মাপও গ্রহণ করতে ভুললাম না। কারণ কে বলতে পারে যে শখের কারণে বা চুরি করার জন্য কোথাও তার দেহের ওজন গৃহীত হয় নি। এ'ছাড়া অন্য কোথাও হতে মৃত ব্যক্তির জামা প্রভৃতি উদ্ধার করে উহাদের মাপ হতে আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে, ঐগুলির অধিকারী ঐ মৃতব্যক্তিই। এইজন্য আমরা একটি ভাল দর্জিকে ডাকিয়ে এনে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহানুযায়ী কোটের ও শার্টের এক একটা মাপ তুলেও নিই। এই ভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য সমাধা করে মৃতদেহের বিভিন্ন অবস্থার আরও দুইটি আলোক-চিত্র গ্রহণ

করে আমরা আমাদের পুলিশ সার্জেনকে ডেকে আনবার জন্য ট্যাক্সি সহ একজন জুনিয়ার অফিসারকে পাঠিয়ে দিলাম। কারণ সঠিকভাবে কোন্ সময় হতভাগ্য লোকটি নিহত হয়েছিল তা তদন্তের কারণে আমাদের আশু জানা দরকার। ডাক্তার সাহেব অনতিবিলম্বে ঘটনাস্থলে এসে মৃতের দেহের কাঠিন্য ও রক্তের জমাট পরীক্ষা করে বলে দিলেন যে, ঐ ব্যক্তিকে গতকাল সন্ধ্যা নয়টা আন্দাজ সময়ে নিহত করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইনেসপেক্টর রায় নিজে একজন ডাক্তার না হলেও স্বকীয় অভিজ্ঞতা হ'তে ইতিপূর্বেই খুনের সময়রূপে ঐ সময়টাই নির্দেশ করেছিলেন।

এরপর ধরাধরি করে আমরা মৃতদেহটি রাস্তার উপর এনে হাজির করলাম। স্বভাবতই প্রথম হতে একটি বিরাট জনতা সেখানে জড় হয়েছিল। এক্ষণে এই জনতা বহুগুণে বর্ধিত হয়ে উঠল। আমরা জনতা অপসারিত ত করিই নি বরং চাইছিলাম যে, আরও অধিক সংখ্যক লোক এসে মৃতদেহটি দেখে যাক। বস্তুতপক্ষে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ নিকট ও দূর হতে আগত বহু নাগরিককে আমরা ঐ মৃতদেহটি দেখে যাবার সুবিধে করে দিলাম। এই খুন সম্পর্কিত সংবাদ ইতিমধ্যে শহরের নানা দিকে রটে গিয়েছিল। এইজন্য বিশেষ করে নিখোঁজ ব্যক্তিদের আত্মীয়রা দলে দলে অকুস্থলে এসে উপস্থিত হচ্ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহাদের মধ্যে কেহই ঐ মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে পারলো না। এই কারণে স্বভাবতই ধারণা হবার কথা যে, ঐ মৃত ব্যক্তি ঐ অঞ্চলের কোনও বাসিন্দা ছিল না। কিন্তু শান্তিরক্ষীদের মন কখনও চিত্তপ্রস্তুতির দ্বারা অভিভূত রাখা উচিত নয়। এইজন্য আমরা তখনও পর্যন্ত কোনও স্থির অভিমত মনের মধ্যে পোষণ করি নি।

এর পর আমরা ঐ মেথর গলিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আর একবার পরিদর্শন করি। কিন্তু খুন সম্পর্কে কোনও প্রমাণ বা চিহ্ন আমরা আর একটিও পাই নি। তবে নিকটে অপর একটি প্রাচীরের গর্তের মধ্যে আমরা একটি কুকুরকে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় শায়িত দেখি। সম্ভবত আসামিগণ ব্যতীত এই একটি মাত্র জীব ঐ বীভৎস হত্যা দেখে থাকবে, কিন্তু এই ভীত ও ত্রস্ত কুকুরটি মূক বিধায় সে আমাদের কোনও উপকারেই এল না।

আমরা প্রথমে এই কুকুরটির মালিক সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করবো মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু করপোরেশনের মেথর মোহন আমাদের জানিয়ে দিল যে, ঐ কুকুরটির কোনও মালিক নেই এবং সে উহাকে প্রতিদিনই ঐ গলিতে ঘুরাফিরা করতে দেখেছে। কুকুরটিকে ঐ স্থানেরই একজন পুরাতন বাসিন্দারূপে বুঝে আমরা তদন্তের এই সম্ভাব্য পথটি তখনই পরিত্যাগ করি।

এর পর আমরা অকুস্থলের প্রায় প্রতিটি বাড়ির বাসিন্দাদের এই খুন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তারা এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কোনও সংবাদ দিতে পারে না। বস্তুতপক্ষে ঐ হত্যাকাণ্ড রাত্রিযোগে ঐ নিরালা গলিতে সমাধা হওয়ায় এই সম্পর্কে তাদের পক্ষে কোনও খবর না রাখা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

ঐ দিন ঐ মুণ্ডহীন দেহটি পরিদর্শন করে মাত্র এইটুকু জেনেছিলাম যে, মৃত ব্যক্তি জনৈক ২৭ বা ২৮ বৎসরের মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্রাহ্মণ যুবক ছিল। এবং উহাকে সম্ভবত পূর্ব রাত্রে আট বা নয় ঘটিকা আন্দাজ সময়ে নিহত করা হয়ে থাকবে। ঐ মৃতদেহ-সংলগ্ন যজ্ঞোপবীত (পৈতা), রক্তের অসম্পূর্ণ জমাট এবং মৃতদেহের হাতের ও পায়ের চেটো সহ দেহাবয়বের স্বরূপ প্রভৃতি হতে আমরা এই কয়টি সিদ্ধান্তে আসি। এই দিন তদন্ত সম্পর্কে আর কোনও সফলতা লাভ

করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে পরে মৃতদেহের লোমাকীর্ণ বাম বাহুতে উল্কিদ্বারা উৎকীর্ণ একটি বেলফুল আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। মৃতদেহের বাহুর ঐ উল্কি-চিহ্ন হতে একদিন তাকে সনাক্ত করানো সম্ভব হবে বুঝে আমরা মৃতদেহটি কলিকাতার পুলিশ মর্গে পাঠিয়ে দিই। এই সম্পর্কে ঐ পুলিশ মর্গের রক্ষককে আমরা আরও অনুরোধ জানাই যে, শব-ব্যবচ্ছেদের পর যেন ঐ দেহটি তাদের বরফ-যুক্ত ঠাণ্ডা ঘরে অন্তত পনের দিন রক্ষা করা হয়।

এর পর যথারীতি মৃতদেহের পোস্টমর্টেমের জন্য পুলিশ সার্জেনের নিকট প্রয়োজনীয় নথিপত্র পাঠিয়ে আমরা তখনকার মত একটা অক্ষমতার গ্লানি নিয়ে ক্ষুণ্ণ মনে থানায় ফিরে এলাম। প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করতে করতে এইদিন রাত্রি নয়টা বেজে গিয়েছিল। এইজন্য তদন্তসম্পর্কীয় পরবর্তী কার্যকরণ সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতেই আমরা যে যার নির্দিষ্ট বাসভবনে বিশ্রামের জন্য ফিরে এলাম।

পরদিন ৬ই সেপ্টেম্বর—প্রত্যূষে ভোর ছটার সময় আমরা যে যার কোআর্টার হতে নেমে থানার অফিসে এসে পুনরায় এই হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে তদন্তরত হলাম। ইতিমধ্যে লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগ হতেও দুইজন অফিসার আমাদের সাহায্য করবার জন্য এসে গিয়েছিলেন। ইনেস্‌পেক্টর সুনীল রায়, আমি স্বয়ং এবং তাঁরা—এই চারজন অফিসার দস্তুর মত সেখানে একটি রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স বসিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ, টিম্‌-ওআর্ক ভিন্ন এই সকল দুরূহ তদন্তের সমাধা করা দুঃসাধ্য ছিল। আমাদের সম্মুখে প্রধান সমস্যা ছিল তিনটি, যথা,—প্রকৃতপক্ষে খুনী কে? কে খুন হলো? এবং কখন, কোথায় বা কিরূপে এই খুন সমাধা হলো? ঐ সময় কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগে উন্নত ধরনের কার্যপদ্ধতি কেন্দ্র এবং ফোরেন্সিক ল্যাবোরেটারি স্থাপিত হয় নি। এইজন্য ঐরূপ আলোচনার জন্য আমাদের স্বকীয় অভিজ্ঞতা-

সমূহই একমাত্র সম্বল ছিল। তবে যতটা বৈজ্ঞানিক সাহায্য পাওয়া যায় ততটাই সুবিধা। এইজন্য দুইজন গোয়েন্দা অফিসারকে আরও তদন্তের জন্য বাহিরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ও সুনীলবাবু পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের অপেক্ষায় থানায় উপস্থিত থাকলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময় দেহব্যবচ্ছেদ সমাধা হবার পর আমদের বহু আকাঙ্ক্ষিত পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থানায় এসে পৌছিল। এই রিপোর্টের সারবস্তুর একটি অনুলিপি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"মৃত ব্যক্তির বয়স অনুমান সাতাশ বা আটাশ। পাকস্থলীর পাচ্যমান খাদ্যের স্বরূপ ও রক্তের জমাট প্রভৃতি হতে বুঝা যায় যে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি আন্দাজ আট বা নয় ঘটিকায় ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। অধিকন্তু ইহাও জানা গিয়াছে যে, প্রথমে ঐ মৃত ব্যক্তির বক্ষে ছুরিকাঘাত করা হয়। ঐ সময় মৃতমন্য ভাবে সে পতিত হলেও তার মৃত্যু হয় নাই। ইহার কিছু পরে তার মুণ্ডটি কেটে নেওয়া হলে সে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু বরণ করে। অর্থাৎ তার মুণ্ডটি তার জীবিত অবস্থাতেই কর্তন করা হয়েছিল। বিশেষরূপে পরীক্ষা দ্বারা বুঝা গিয়েছে যে মুণ্ডটি তার মৃত অবস্থাতে কর্তন করা হয় নি।"

এইবার আমরা বুঝতে পারি যে, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ সনে রাত্রি ৮ বা ৯ ঘটিকায় ঐ মেথর গলিতে একজন ২৭ বা ২৮ বৎসর বয়স্ক যুবককে জোর করে বা ভুলিয়ে নিয়ে এসে প্রথমে ছুরি দ্বারা আহত ও পাতিত করা হয় এবং তাহার কিছু পরে তার মুণ্ডটি কর্তন করে তাহার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। এই সম্পর্কে আমরা আরও একটি বিষয়েও বিবেচনা করি। ঐ ভারি মৃতদেহটি মাত্র একজনের পক্ষে দেওয়ালের ঐ গহ্বরের মধ্যে ন্যস্ত করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং নিশ্চয় একাধিক ব্যক্তি ঐ কার্যে নিযুক্ত হয়েছিল। এই তথ্যটি হতে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে, হত্যাকাণ্ডটি দুই, তিন

বা ততোধিক ব্যক্তি দ্বারা সমাধা হয়েছে। কিন্তু এই সকল বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সম্মুখে মূল তিনটি প্রশ্নই অমীমাংসিত রয়ে গেল। যথা—খুন হলো কে? কে বা কারা খুন করল? এবং কি উদ্দেশ্যে তারা এই খুন করলো? এই তিনটি বিষয় অবগত হওয়া মাত্র যে, এই খুনের কিনারা করা সহজ হয়ে উঠবে তা একজন সাধারণ মানুষও বোঝে, কিন্তু এই দুরূহ তথ্য তিনটির সমাধান কে আমাদের করে দেবে? কোনও এক অজ্ঞাত বিষয়-বস্তু অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত হতে হলে গবেষকগণ গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রথমে কয়েকটি সম্ভাব্য পরিসজ্ঞা কল্পনা করে নিয়ে থাকেন। তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা কার্য এই নিয়মেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তদন্তকারী রক্ষিগণ এক একটি করে প্রতিটি থিওরি অনুসরণ করে প্রকৃত সত্য নিরূপণ করতে প্রয়াস পেয়ে থাকেন। একটি থিওরি কিছুটা দূর অনুসরণ করে যদি বুঝা যায় যে, সম্মুখে আর পথ নেই বা উহা বন্ধ তা'হলে তাঁকে ফিরে এসে দ্বিতীয় এক থিওরি অনুযায়ী তদন্তের কায করে যেতে হয়েছে। এমনি করে একটির পর একটি থিওরি পর্যালোচনা করে রক্ষিগণ পরিশেষে দেখতে পান যে তাঁদের একটি থিওরি অপরাধ-নির্ণয়ের ব্যাপারে ফলপ্রদ হতে চলেছে। অর্থাৎ ঐ অপরাধ সম্বন্ধে তাঁরা যা অনুমান বা থিওরি করেছিলেন, তাদের মধ্যে একটি মিথ্যা নয়, সত্য। এইজন্য এই হত্যাকাণ্ডটি সম্পর্কে তদন্তের সুবিধার জন্য প্রথমে আমরা নিম্নোক্তরূপ কয়েকটি থিওরি তৈরি করে নিই। বলা বাহুল্য, যে সকল তথ্য বা ডাটা আমরা পরিদর্শন ও অনুমান দ্বারা ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম, উহাদের উপর নির্ভর করেই আমরা ঐ সকল থিওরি সৃষ্টি করি।

(১) নিহত ব্যক্তি হয়তো নিকটস্থ কোনও জমিদার বা ধনীর বাড়িতে রাঁধুনী ব্রাহ্মণ ছিল এবং তার নিয়োগকর্তারা ধনীই হবে,

তা না হলে রাঁধুনী রাখবে কি করে? এদেশে ব্রাহ্মণদিগকে রাঁধুনী নিযুক্ত করা হয়। চাকররূপে তাদের নিয়োগ প্রায়শ করা হয় নি; পূর্ব-অভিজ্ঞতা হতে আমাদের এই সত্য জানা আছে। অতএব এই থিওরি অনুসারে নিহত ব্যক্তি যে রাঁধুনী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ঐ জমিদার বা ধনী ব্যক্তির কোনও বিধবা বা অনূঢ়া কন্যার সহিত হয়তো ঐ নিহত ব্যক্তির প্রেম হয়ে থাকবে। ঐদিন রাত্রে বাড়ির লোকেরা এই গোপন প্রেম ধরে ফেলে ঐ রাঁধুনী বামুনকে তাদের বাড়িতে বা ঐ মেথরগলিতে হত্যা ক'রে চার পাঁচ জন মিলে দেহটাকে রাত্রে এইখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই থিওরি অনুযায়ী আমরা সম্মুখ এবং বিপরীত, এই উভয় প্রকার তদন্ত শুরু করি। আমরা চর লাগিয়ে জানতে চেষ্টা করি যে অকুস্থলে কেহ এইরূপ অবৈধ প্রেমের ব্যাপার অবগত হয়েছে কিনা বা এইরূপ গুপ্ত-প্রেম সম্বন্ধে পাড়ায় কোথাও কখনও কানাকানি বা জানাজানি হয়েছে কিনা? ঐ খুন যদি কারও বাটীর মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে তা'হলে ঐখানে প্রভূত রক্ত পড়বে এবং এই রক্ত তারা গোপনে ধুয়ে বা মুছে ফেলে দেবে। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানবার চেষ্টা করি, কেউ কারও বাড়ির সম্মুখের নালা বা নর্দমার জল অস্বাভাবিক ভাবে লোহিতাভ দেখেছে কিনা? আমরা করপোরেশনের মেথরদেরও জিজ্ঞাসা করতে থাকি, কেউ রক্তমাখা ন্যাকড়া কোথাও পড়ে থাকতে দেখেছে কিনা? যদি আমরা উপরোক্তরূপ কোনও সংবাদ পেতাম তাহ'লে বুঝে নিতাম যে, আমাদের উপরোক্ত থিওরিটিই সত্য এবং উহাকেই আমরা আমাদের শেষ সিদ্ধান্ত করে—ঐ বিশেষ পথেই আমরা তদন্তরত থাকতাম। কিন্তু তথ্য-তল্লাস ও অনুসন্ধান দ্বারা আমরা এইরূপ কোনও সন্ধানই পাই নি। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আমরা তখন নিম্নোক্তরূপ আমাদের দ্বিতীয় পরিসংজ্ঞা বা থিওরি অনুযায়ী তদন্ত শুরু করে দিই।

(২) নিহত ব্যক্তি হয়তো কোনও এক দুর্বৃত্ত অথচ প্রভাবশালী ব্যক্তির ভ্রাতা। পৈতৃক সম্পত্তি হতে চির-তরে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ঐখানে বা অন্য কোথাও তাকে হত্যা করে, পরে সহকারীদের সাহায্যে তাকে এইখানে এনে ফেলে রেখে গিয়েছে। ইহা সত্য হলে ধরে নিতে হবে যে ঐ নিহত ব্যক্তি কোনও এক ভদ্র ও ধনীপরিবারের পুত্র ছিল। কিন্তু ঐ নিহত ব্যক্তির দেহটার এবং হাতের ও পায়ের চেটো পরিদর্শন করে বুঝা গেল যে ঐ ব্যক্তির ধনীর ঘরে বর্ধিত না হও-াই স্বাভাবিক। কারণ তার পায়ের চামড়া স্থূল ও কর্কশ এবং বিক্ষত দেখা গিয়েছে। এই থেকে নিহত ব্যক্তিকে বরং একজন ভবঘুরে বা অধঃপতিত মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বলেই প্রতীত হয়। এইজন্য এই থিওরি বা পরিসংজ্ঞাটি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

(৩) হয়তো নিহত ব্যক্তি একজন অসৎচরিত্র যুবক। কোনও স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপারে তার কোনও এক প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রেমিকপ্রবর স্বয়ং কিংবা লোক মারফৎ তাকে নিহত ক'রে ঐখানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই ব্যাপারে আমরা পুলিশ সার্জেনকে শব-ব্যবচ্ছেদের সময় তার যৌনদেশ পরীক্ষা করে জানাতে অনুরোধ করি যে ঐ নিহত ব্যক্তির কোনও যৌন-রোগ ছিল কিনা? এবং নিকটস্থ বেশ্যালয় সমূহে ঐরূপ কোনও ব্যক্তি বন্ধু-বান্ধবসহ হামেসা কোনও বেশ্যা-গৃহে গমন করত কিনা, তা'ও আমারা অবগত হতে চেষ্টা করি। এইরূপ দুই একটি ঝগড়া-ঝাটির সংবাদ আমরা কয়েক স্থানে পাই বটে, কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে বিবাদীরা বাহাল তবিয়তে জীবিত আছে। এইরূপ কোনও এক ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হ'য়েছে বলে একদিন জানা যায়, কিন্তু ঐ বেশ্যা-নারী এবং দালালেরা মৃতদেহটি ঐ নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির নয় বলে বিবৃতি দেয়।

(৪) হয়তো বা নিহত ব্যক্তি কোনও এক ব্যবসায়ী বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার এবং তাকে ঐ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অধিকার

হতে বঞ্চিত করবার জন্য এইভাবে হত্যা করেছে। এই থিওরিটি বিশ্বাস করলে বুঝে নিতে হবে যে নিহত ব্যক্তি অপুত্রক বা আত্মীয় ও উত্তরাধিকারী বিহীন।

উপরোক্ত থিওরি অনুযায়ী অনুসন্ধান করে ঐরূপ কোনও নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির সন্ধান আমরা পাইনি। বড়বাজারে ঐরূপ এক নিখোঁজ মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সংবাদ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তদন্তে জানা গেল যে নিরুদ্দেশের সময় ঐ ব্যক্তির বয়স ছিল ৬৫ বৎসর। তদুপরি মৃত যুবকের দেহাবয়ব ও আকৃতিও এই থিওরির পক্ষে অনুকূল ছিল না।

এই সকল কারণে এই সকল থিওরি সম্পর্কীয় তদন্ত আপাতত স্থগিত রেখে আমরা নিম্নোক্ত থিওরি বা পরিসংজ্ঞা অনুযায়ী তদন্ত শুরু করে দিই।

(৫) হয়তো বা সে কোনও রাজনৈতিক দলাদলি বা শ্রমিক-বিভ্রাটের কারণে নিহত হয়ে থাকবে। কিন্তু নিকটে কোনও কলকারখানা ছিল না এবং তার চেহারা হতে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারে সে জড়িত থাকতে পারে বলে মনে হলো না। এইজন্য ঐ বিষয়ে কোনও তদন্ত আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করেছিলাম।

(৬) হয়তো বা নিহত ব্যক্তি কোন পুরানো চোর বা তস্কর ছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কিংবা দলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করায় কিংবা অপরের হিস্যা আত্মসাৎ করার জন্য তার দলের অপরাপর ব্যক্তিরা তাকে ঐ ভাবে হত্যা ক'রে ঐ স্থানে ফেলে রেখে গিয়েছে।

এই সম্পর্কে আমরা রক্ষীপুঙ্গবদের তাদের কোনও জানা চোর বা 'ইনফরমার' ঐ দিন হতে নিখোঁজ হয়েছে কিনা সেই সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য অনুরোধও করেছিলাম, কিন্তু কোনও স্থান হতেই এইরূপ কোনও সংবাদ আমরা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি।

যদিও উপরোক্ত কয়টি থিওরি বা পরিসংজ্ঞার উদ্ভাবক আমি নিজেই ছিলাম, তা'হলেও পরিপূর্ণভাবে উহাদের কোনটি আমার নিজেরই মনঃপূত হচ্ছিল না। কারণ একটি বিষয় পুনঃ পুনঃ আমার মনোমধ্যে আঘাত হানছিল; সাধারণত মৃতদেহ হতে মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন করার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে, যাতে তাকে কেউ সনাক্ত না করতে পারে। বহুদূর হতে মৃতদেহ ঐ স্থানে নীত হলে মুণ্ড কর্তনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। এইজন্য স্বভাবতই মনে হতে পারে যে নিহত ব্যক্তি ঐ স্থানেরই কোনও বাসিন্দা ছিল। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে এই মত সম্পর্কে আমার মন সায় দেয় না। কারণ হত্যাকারী এমন এক বিজাতীয় ঘৃণার সহিত এই হত্যাকাণ্ড সমাধা করেছিল যে, প্রথমে সে তাকে ছুরিকাঘাত করেও যথেষ্ট মনে করে নি। সেইজন্য মুণ্ডটি কেটে নেওয়ার পরও মৃতদেহের দুইটি পায়ের শিরা পর্যন্ত কেটে রেখে গিয়েছে। এই কয়টি তথ্য হতে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে হত্যাকারী একজন দুর্দান্ত প্রকৃতির ব্যক্তি তো বটেই, অধিকন্তু সে মানব মনের একজন অসাধারণ অবস্থার সন্ততি। এই ধরনের ব্যক্তি প্রেম ঘটিত ব্যাপারে কোনও এক ভদ্র নারীর সহিত নিশ্চয়ই জড়িত থাকবে না। তা'হলে কি ঐ নিহত ব্যক্তি এবং উহার হত্যাকারী, এই উভয় ব্যক্তিরই যাতায়াত হামেসা বেশ্যাপল্লী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল? এই সকল বিষয় চিন্তা করে ইনেস্পেক্টার সুনীল রায়কে আমার অভিমত জানালে তিনি আমাকে সর্বান্তঃকরণেই সমর্থন করেছিলেন। এইজন্য পরদিন হতে সোনাগাছি প্রভৃতি বেশ্যাপল্লীর প্রতিটি গৃহে আমরা জোর তদন্ত চালাতে শুরু করে দিলাম।

এইভাবে তদন্ত করতে করতে সত্য সত্যই একদিন আমরা অন্ধকারের মধ্যে আলোকের সন্ধান পেলাম। এই সময় সোনাগাছি অঞ্চলের অম্বিকা নামক এক বাসিন্দা একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ প্রদান করলো।

বস্তুতপক্ষে অম্বিকার বিবৃতি আমাদের তদন্তের মোড় সম্পূর্ণরূপে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। সাক্ষী অম্বিকার বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি অতুলবাবু ওরফে পাগলা নামক এক ব্যক্তিকে চিনতাম। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বাড়ি ফিরবার সময় আমি তাকে ভীত ও ত্রস্তভাবে সোনাগাছি অঞ্চলের একটি বাটীর রোয়াকে মণীন্দ্রবাবু নামক পাড়ার এক মাতব্বর ব্যক্তির নিকট বসে থাকতে দেখেছিলাম। ঐ সময় উহাদের চতুর্দিক ঘিরে কয়েকজন গুণ্ডা ব্যক্তি তাকে বকাবকি করছিল। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললো, 'মনে রাখিস, আমি যে সে লোক নই। আমি হচ্ছি খোকা! আমার নাম শুনেছিস তো? আমি তোকে খুন তো করবোই, সেই সঙ্গে তোর নাকও কেটে নেবো।' উত্তরে পাগলা বলছিল, 'আমাকে আপনি এবার-কার মত মাপ করুন। আমি জীবনে আর ঐ স্ত্রীলোকটির ত্রিসীমানাতেও যাব না।' মণীন্দ্রবাবু মধ্যস্থতা করে এই সময় লোকটিকে অনুরোধ জানালো, 'আচ্ছা যাক গে যাক। এবারকার মত ওকে মাপ করে দিন।' মণীন্দ্রবাবুর অনুরোধে ঐ লোকগুলো পাগলাকে মুক্তি দিয়ে চলে গেলে পাগলা আমার পাশে পাশে চলে গরানহাটা স্ট্রিটের দিকে এগুতে থাকলো। আমরা কিছুদূরমাত্র অগ্রসর হয়েছি, এমন সময় ঐ খোকা নামক ব্যক্তি গৌরবর্ণের অপর আর এক ব্যক্তির সহিত একটি বাড়ির রোয়াক হতে পাগলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। খোকা পাগলার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে ঐ গৌরবর্ণের লোকটাকে হুকুম করলো, 'এই, জলদি গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আয়।' ব্যাপার বেগতিক বুঝে আমি সরে পড়ছিলাম। কিন্তু গৌরবর্ণের লোকটি আমার পথ আগলে বলে উঠলো, 'তুই শালা যাস্ কোথায়?' আমি প্রতিবাদ করে তাকে বললাম, 'গালি দেন কেন, মশাই।' উত্তরে সেই লোকটি বলে উঠলো.

'আর একটামাত্র কথা কইলে তোকেও খুন করবো।' এই সময় খোকা ঐ লোকটিকে বললো, 'ওকে এখন যেতে দে, ওকে পরে ঠিক করা যাবে এখন। তুই তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে আন।' এই ভাবে মুক্তি পেয়ে আমি ফিরে গিয়ে ঘটনাটির কথা মণীন্দ্রবাবুকে জানিয়ে আসি। এর পর বাড়ি ফিরবার পথে আমি দেখতে পাই যে, খোকা, ঐ গৌরবর্ণের লোকটি এবং আরও চার পাঁচ ব্যক্তি পাগলাকে একটি ট্যাক্সিতে বসিয়ে গরানহাটা রাস্তা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে ট্যাক্সিটির নম্বর নেবার কথা একবারও আমার মনে আসে নি।"

ভারতীয় পদ্ধতিতে তদন্তরীতির নিয়ম, প্রথমে সাক্ষীকে বিনা বাধায় তার বক্তব্য বিষয়ে বলে যেতে দেওয়া। তার পর তাকে জেরা করে সে যা বলে নি বা বলতে পারে নি তা বার করে নেওয়া। এইজন্য প্রথমে একদল সৌম্যমূর্তি রক্ষী বাক্যালাপ দ্বারা সাক্ষীদের প্রারম্ভিক বিবৃতি গ্রহণ করে। কিন্তু যেহেতু ঐ প্রথম রক্ষীর পক্ষে সহসা ভিন্ন মূর্তি ধারণ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়, সেইহেতু জেরার জন্য পরে গম্ভীর মূর্তিতে অপর একজন রক্ষীকে আসরে অবতীর্ণ হতে হয়। এইজন্য ভারতীয় অফিসারদের অভিনয় চাতুর্যেও শিক্ষিত হতে হয়েছে। এ'ছাড়া মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টি অনুযায়ী তাদের ভিন্ন ভিন্ন পারিবেশেরও সৃষ্টি করতে হয়েছে। এইজন্য ভারতীয় অফিসারগণ সমাজ-বিজ্ঞান ও লোক-চরিত্র অভিজ্ঞ হয়ে থাকেন। প্রথম অফিসারটি বন্ধুভাবে সাক্ষীদের কিছুটা তাঁবে রাখে, দ্বিতীয় অফিসার গম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে তার কাছ হতে কথা বার করে।

এইভাবে ভারতীয় পন্থায় আমরা ঐ অতি প্রয়োজনীয় সাক্ষীর নিকট হতে যে সকল বাড়তি তথ্য সংগ্রহ করি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তর হতে বুঝা যাবে।

প্রঃ—হুঁ, তুমি যে সত্য কথা বললে তা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু কয়েকটা কথা আরও তোমাকে আমরা জিজ্ঞাসা করবো। এখন সত্যি করে বলো কবে ও কোথায় তোমার সঙ্গে ওর প্রথম আলাপ হয়েছিল ?

উঃ—আজ্ঞে, যখন কিছুটা বলেছি, তখন বাকিটাও বলবো। পাগলার সঙ্গে আমার এই পাড়াতেই এখানে ওখানে দেখা হতো। তার ভালো নাম ছিল অতুলবাবু। এসব পাড়ার মেয়েরা তাকে আদর করে পাগলা বলতো। লোকটা বাবু ভালো তবলা বাজাতো। তালচি রূপে এপাড়া ওপাড়া, সব পাড়াতেই সে নাম করে'ছল।

প্রঃ—আচ্ছা ! তোমার তো সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। তুমি কি শোননি যে সম্প্রতি ঐ পাড়ার কোনও সুন্দরী নারীর সঙ্গে তার ভালবাসা জন্মে ছিল ? এইরূপ কোনও গল্প কি সে তোমায় কখনও বলে নি ?

উঃ—আজ্ঞে, সে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না। তবে তার সঙ্গে আমার সাধারণভাবে জানাশুনা ছিল। এ পাড়ার মেয়েরা তাদের গুরুজী বা ওস্তাদের সঙ্গে ঐরূপ কোনও কাজ করে না। এতে ঐসব মেয়েদের মত তাদের ওস্তাদদেরও বদনাম হয়। এইজন্য ঐরূপ কোনও ঘটনা ঘটলেও লজ্জার খাতিরে সে তা আমার নিকট গোপন করেছে।

প্রঃ—আচ্ছা, তুমি তো অনেকবার পাগলাকে দেখেছো। কিন্তু নগ্ন অবস্থায় তার মুণ্ডহীন দেহটা দেখে কি তুমি তাকে সনাক্ত করতে পারবে ? তুমি যে তাকে কিছুটা স্নেহ করতে তাতো বুঝতেই পারছি। এখন পূর্ববন্ধুত্বের খাতিরে তার উপর তোমার একটা কর্তব্য আছে। এখন তুমি যদি তার কোনও প্রেমাস্পদ নারীকে খুঁজে বার করতে পারো তা'হলে ভাল হয়। হয়তো তারা তাকে বহুবার নগ্নগাত্রে দেখে

থাকবে। সেইজন্য তাদের পক্ষে নগ্নগাত্র মৃতদেহটি যথাযোগ্যভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হবে।

উঃ—আজ্ঞে, অধিকাংশ সময়েই আমরা তাকে ধুতি, জামা ও চাদরে আবৃত দেখেছি। তাকে নগ্নগাত্রে ভালোরূপে না দেখলে তার মৃতদেহ সনাক্ত করার অসুবিধা আছে স্বীকার করি। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে অতীতে তাকে নগ্নগাত্রেও বহুবার আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেছে। ইদানী পাগলা অতিরিক্ত মদ্যপান করতে আরম্ভ করেছিল। কয়েকবার মাত্রা ছাড়িয়ে তাকে জ্ঞানহারা ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় রাজপথে গড়াগড়ি যেতে আমরা দেখেছি। এইজন্য তাকে ভৎর্সনা করে ও পথ থেকে উঠিয়ে নিকটের কোনও নারীর বাড়িতে এনে আমরা তার শুশ্রূষাও করেছি। এই সময় আমরা তার সারা দেহ ও বাহু লোম দ্বারা আবৃত এবং তার বাম বাহুতে উল্কি দ্বারা ফুল চিহ্ন উৎকীর্ণ আছে দেখেছি। তার শরীরের গঠনসহ ঐ সকল চিহ্ন হতে তার মুণ্ড না থাকলেও তার দেহ আমরা সকলেই সনাক্ত করতে পারব।

সাক্ষী অম্বিকার উপরোক্ত বিবৃতিটি আমাদের অনেকটা আশ্বস্ত করলো। আমরা বুঝতে পারলাম যে ঐ সাক্ষীর ন্যায় সোনাগাছি অঞ্চলের বহু নারীও পাগলার মৃত দেহটি ঐ একই কারণে সনাক্ত করতে পারবে। বলা বাহুল্য যে মৃতদেহটি সত্যই কাহার তা প্রমাণ করতে না পারলে এই খুনের কিনারা করা সম্ভব ছিল না। ইতিমধ্যে পুলিশ-মর্গের বরফ-ঘরে আমরা মৃতদেহটি রক্ষা করায় এই কয়দিন উহা অবিকৃত অবস্থাতেই ছিল। এই কারণে আমি প্রস্তাব করলাম যে এখনই ঐ পাড়ার বাড়ি বাড়ি তদন্ত করে কোন্ কোন্ নারীকে পাগলা গান শেখাতো বা তাদের কার কার বাড়িতে সে তবলা বাজাতো তা জেনে ঐ সকল নারীকে পুলিশমর্গে নিয়ে গিয়ে তাদের সাহায্যে ঐ মৃতদেহটি সত্যই পাগলার কি'না তা অবহিত হওয়া যাক। কারণ তারা

যদি বলে যে ঐ মৃতদেহ আদপেই পাগলার নয়, তাহলে তখনই বুঝে নিতে পারবো যে আমরা এই কয়দিন ভুল পথেই তদন্ত চালিয়ে এসেছি। এইরূপ অবস্থায় অনর্থক আর সময় নষ্ট না করে আমরা তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য আর এক পথে তা পরিচালিত করতে পারবো। কিন্তু ইনেস্পেক্টার সুনীলবাবু এবিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি বললেন যে এই পাড়াতে যখন আসা হয়েছে তখন সাক্ষী মণীন্দ্রকে খুঁজে বার করে তার বিবৃতিটি নিয়ে যাওয়া উচিত। সনাক্ত করণের পূর্ব বরং আরও দুই একদিন পরে করলেও চলবে। এ সম্বন্ধে তিনি আরও বললেন যে, তাঁর অন্তরাত্মা তথা ইনস্টিংট্ বলছে যে এইবার আমরা ঠিক পথেই তদন্ত শুরু করেছি।

বস্তুতপক্ষে অভিজ্ঞতা হতে আমরা দেখেছি যে ইন্‌টেলিজেন্স বা বুদ্ধিবৃত্তি ভুল করলেও সহজাত বুদ্ধি (ইনস্টিংট্) বা প্রেরণা কদাচিৎ ভুল করেছে। স্ব স্ব ব্যবসায়ক্ষেত্রে বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি সাহায্যে আসে এই প্রেরণা। প্রত্যেক প্রফেশনাল ব্যক্তিই স্ব স্ব প্রফে-শনের ক্ষেত্রে এই সহজাত প্রেরণা লাভ করে থাকে। সকল প্রফেশনের লোকেরাই স্ব স্ব প্রফেশন বা ব্যবসা সংক্রান্ত ব[illegible] পৃথক পৃথক ইনস্টিংক্ট অর্জন করেছে। এমন অনেক ডাক্তার আছে যারা দূর হতে রোগীকে দেখে বলে দিতে পারে যে তার রোগ কী। এমন অনেক পুষ্প-বিক্রেতাকে আমি জানি যে খরিদ্দারদের দেখে বলে দিতে পেরেছে, সে ফুল কিনবে কি না এবং কিনলেও সে তার দাম দেবে কত। বহুদিন একই প্রফেশনে নিযুক্ত থাকলে মানুষ এইরূপ পেশাগত ইনস্টিংক্ট্ লাভ করে। এমন বহু পুরাতন পুলিশ অফিসার আছেন, যাঁদের নিকট দশ বার জন গৃহ-ভৃত্যকে দাঁড় করিয়ে দিলে তাঁরা বলে দিতে পারেন যে এদের মধ্যে কোন্ লোকটি চুরি করেছে। এ সম্বন্ধে তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁদের একমাত্র উক্তি হয় যে তাঁদের মন

বা ইনস্টিঙ্কট্ এই কথা বলেছে। পরে প্রমাণিতও হয়েছে যে ঐ পৃথকীকৃত ভৃত্যটিই মাত্র ঐ চুরির জন্য দায়ী ছিল। বহুদিনের অভিজ্ঞ ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি লোকেরা প্রায়ই এই সহজাত প্রেরণা লাভ করেন। কারণ মানুষের অন্তঃস্বভাব তাদের মুখের ভাব, চালচলন ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছুটা পরিস্ফুট হতে বাধ্য। কিন্তু ঐগুলি এতো সূক্ষ্মভাবে পরিস্ফুট হয় যে সাধারণ দৃষ্টিতে সকল মানুষের নজরে পড়ে না। তবে যে সকল পুলিশ অফিসার পুলিশি-কার্যকে চাকুরিরূপে গ্রহণ না করে প্রফেশন বা পেশারূপে গ্রহণ করে, তাদের চক্ষে ঐগুলি নিজেদের অজ্ঞাতেই ধরা পড়ে। এই সকল কারণে পরবর্তীকালে এই সকল কর্মদক্ষ পুলিশ অফিসারদের মধ্যে যাঁরা পুলিশি-কার্যকে নিজেদের স্ত্রীপুত্রকন্যা—এমন কি নিজেদের প্রাণের চেয়েও ভালবেসে ফেলে তাদের মধ্যে ঐরূপ এক প্রেরণা জন্মায়। এইরূপ অবস্থায় কোনও একটি ঘটনা দেখে বা শুনে তারা বলে দিতে পারে যে ঘটনাটিতে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোসলেম ভারতে এবং ব্রিটিশ রাজত্বের প্রারম্ভে গোয়েন্দাগিরি করা ছিল এক শ্রেণীর নাগরিকদের প্রফেশন বা ব্যবসায়ের অন্তর্গত। এই একই কারণে তাদের মধ্যে প্রায়ই ঐরূপ সহজাত বুদ্ধি দেখা যেতো। এইজন্য ভারতীয় পুলিশ আজও পর্যন্ত তাদের ঐ সকল পূর্ববর্তিগণের অনুকরণে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রেরণার উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল থাকে।

এই সকল কারণে আমি অভিজ্ঞ অফিসার ইনেস্পেক্টার সুনীলবাবুর মতেই মত দিই। বস্তুতপক্ষে রক্ষীপুঙ্গব সুনীলবাবুর মধ্যে আমি পুলিশি তদন্ত সম্পর্কীয় বহু অতীন্দ্রিয়তা (Hiper Sensibility) লক্ষ্য করেছিলাম। তাঁর চক্ষু ও কর্ণ আমি সামান্য একটু সন্দেহের উদ্রেক হওয়া মাত্র শিকারী মানুষের ন্যায় সতেজ হয়ে উঠতে দেখেছি। এই জন্য আমি তাঁর উপদেশ মত মণীন্দ্রবাবুকে খুঁজে বার করে তাঁর একটি

বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিতে মনস্থ করলাম। এই মণীন্দ্রবাবু ছিলেন এই পাড়ার একজন শক্তিমান ব্যায়াম-বীর। এইজন্য তাঁকে খুঁজে বার করতে আমাদের কিছুমাত্রও দেরি হয় নি। তাঁর বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমার নাম শ্রীমণীন্দ্রনাথ পা.., পিতার নাম শ্রী...পাল। × নং... রাস্তায় আমি সপরিবারে বাস করি। আমার পেশা...। এই দিন (৬ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬) আমি ঐ রাস্তায় অতো নম্বরের বাড়ির রোয়াকে সন্ধ্যা আন্দাজ সাত বা সাড়ে সাতটার সময় বিশ্রাম করছিলাম। এমন সময় পাগলা দৌড়ে এসে আমার পাশে বসে পড়ে বলে উঠলো, 'কর্তা, রক্ষে করো আমাকে। তুমি ছাড়া আর কেউই আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।' ওদিকে তার পিছু পিছু খোকাও তার সাত আট জন সাকরেদসহ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। খোকা চেঁচিয়ে উঠে বললো, 'আজ আর কারও সাধ্য নেই যে ওকে বাঁচায় আমার কবল হতে। ওকে আমি অনেকবার সাবধান করেছি ; কিন্তু ও কোনও কথা আমার শুনেনি। কালও ও গোপনে মলিনার ঘরে গিয়েছিল।—না, আজ আর আমি ওকে কিছুতেই ছাড়বো না।' আমি তখন খোকাকে অনুরোধ করে বললাম, 'আরে ভাই! এবারকার মত ওকে ক্ষমা করে দে। আর ও কক্ষনো মলিনার ত্রিসীমানাতেও যাবে না। মলিনার সঙ্গে তোর প্রকৃত সম্পর্ক কি, তা ও নিশ্চয়ই জানে না।' আমার মধ্যস্থতায় খোকা একটু শান্ত হয়ে বললে, 'আচ্ছা! আপনার কথা মত আজ ছেড়ে দিলাম ওকে। কিন্তু পরে ওর কপালে কি আছে তা আমি বলতে পারছি না।' এইভাবে মুক্তি পেয়ে পাগলা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে সরে পড়লো। ঐ সময় সেখানে পাগলার বন্ধু অম্বিকাও এসে গিয়েছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে, পাগলা ও অম্বিকা একসঙ্গেই গরানহাটার দিকে প্রস্থান করলো। এর পর খোকাও

তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঐ একই দিকে রওনা হয়। এই ঘটনার প্রায় আধঘণ্টা পর অম্বিকা হন্তদন্ত হয়ে এসে আমাকে জানালো যে খোকা ও তার সাকরেদরা পাগলাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে ধরে নিয়ে গিয়েছে।"

এই পর্যন্ত বলে মণীন্দ্রবাবু চুপ করলেন। বেশ বোঝা গেল, তাঁর আরও কিছু বলবার ছিল, কিন্তু বলি বলি করেও তিনি তা আমাদের বলতে চাইছিলেন না। আমরা তখন চতুরতার সহিত কয়েকটি প্রশ্ন করে তাঁর নিকট হতে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নিলাম।

প্র—পাগলাকে আপনি কতদিন পূর্ব হতে চেনেন? আর ঐ খোকাবাবু! খোকাবাবু লোকটা কে? সে থাকেই বা কোথায়? আপনি এই খোকার পরিচয় কতটুকু জানেন? তাড়াতাড়ি এই সংবাদ কয়টি দিলে আমাদের উপকার হয়। আমরা তা'হলে এখুনি খোকাকে গ্রেপ্তার করে তার বাড়িতে খানাতল্লাস করতে পারি।

উঃ—পাগলার পিতৃমাতৃ পরিচয় আমি জানি না। তবে শুনেছি তার এক ভাই যশোহরে ডাক্তারি করেন। তার ভালো নাম ছিল অতুলবাবু। লোকটি সদ্‌বংশজাত হলেও খুশিমত অধঃপতিত হয়ে এই পাড়াতেই এখানে ওখানে বাস করে। এই পাড়ার নারীদের বাটীতে বাটীতে উৎসবে ও জলসায় সে তবলা বাজাতো। তবলা সম্বন্ধে সে একজন গুণী ছিল। সে যে চরিত্রহীন ব্যক্তি ছিল তা আমি বলবো না, বরং সে চরিত্রবানই ছিল। তবে চরিত্রবানবাই একনিষ্ঠ হয়ে একটি নারীর সঙ্গে বসবাস করতে চেয়েছে। এইজন্য আমার মনে হয় সে মলিনাকে গান শিখাতে গিয়ে ভালবেসে ফেলেছিল। তবে তাকে এই পাড়ার সকল মেয়েই 'পাগল' বলে ডাকতো। শুধু তাই নয়, তাকে তারা ভালবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো। এ'ছাড়া পাগলা সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ আমি দিতে পারবো না। এই তো গেল পাগলার কথা।

এইবার খোকার কথা বলবো। এই খোকা হচ্ছে—স্যার, একজন জেল-খারিজ গুণ্ডা। কিছুদিন যাবৎ পুলিশের নজর এড়িয়ে সে কলকাতায় ফিরে এসেছে। এখন তার এই পাড়াতেই আনাগোনা বেশ। আমি শুনেছি সে মাঝে মাঝে মলিনার ঘরে এসে রাত্রিবাস করে। এই মলিনা হচ্ছে একজন নূতন চিত্রাভিনেত্রী। ৩৫ নং ইমামবাড়ি থানাদার লেনে সে থাকে।

প্র—পাগলাকে তো আপনারা প্রত্যহই দিনে ও রাত্রে এই পাড়াতেই দেখতেন। ঐ দিন সন্ধ্যা হতে এখন নিশ্চয়ই আর তাকে আপনারা এপাড়ায় দেখেন নি। তবু ঐ ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হয়েও আপনারা কেউ থানায় গিয়ে এই সম্পর্কে সংবাদ দিলেন না কেন? তা'হলে কি বুঝতে হবে আপনার সঙ্গে খোকার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল?

উঃ—আজ্ঞে না না, তা নয়। পাড়ার কেউ কেউ হিংসা করে আমাকে মণি গুণ্ডা বলে। আমি একটু ব্যায়াম-ট্যাযাম করি কিনা তাই লোকের এতো হিংসা। তবে কি জানেন? কোনও গুণ্ডালোক রাত-বিরেতে এসে এখানকার মেয়েদের উপর জুলুম করলে সেইসব বাড়ির বাড়িওয়ালীরা চাকর মারফৎ আমাকে খবর পাঠায়। আমি তখন ঐসকল অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের ঘাড়ে ধরে বার করে দিয়ে তাদের রক্ষে করি। সপরিবারে এই পাড়াতেই আমি বসবাস করি, তাই ওদের পড়শী হিসেবে ওদের উপর আমার কর্তব্য করি, এই যা। তা'না হলে থানা হতে পুলিশ আসতে আসতে এদের অনেকেই শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু তা বলে এইসব জেল-খারিজ খুনে গুণ্ডাদের সঙ্গে কে পেরে উঠবে বলুন? এদের কি কোনও বাড়িঘর আছে যে আপনাদের তা জানাবো। অন্যদিকে এইসব ব্যাপারে থেকে আমারই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। এই বাড়িওয়ালী মায়েরা একটু ভক্তি-টক্তি আমাকে করে, তাই তাদের কাছে যা যা শুনেছি তাই আপনাকে জানালাম।

প্রঃ—হুঁ, এক্ষণে বুঝতে পারলাম আমি সব। এখন এই মামলাতে আর কোনও সংবাদ আপনি আমাদের দিতে পারেন কিনা বলুন।

উঃ—আজ্ঞে! আর একটা কথা আমার জানা আছে। পরে শুনতে পেলাম পথ হতে একবার মুক্তি পেয়ে পাগলা এই পাড়ার 'নাকি বীণা' নামে একটি নারীর বাড়ি ঢুকে পড়ে আশ্রয় ভিক্ষে করে। কিন্তু তারা তাকে আশ্রয় তো দেয়ই নি বরং খোকার হুমকিতে ভয় পেয়ে চাকর দিয়ে তারা তাকে বার করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন এ'কথা তারা স্বীকার করবে কিনা জানি না। কারণ এ পাড়ার কেউ সহজে এ'সব ঝামালাতে জড়াতে চাইবে না।

এ'পাড়ায় ভদ্র পরিবারের লোকেরা হচ্ছে সংখ্যালঘু। এ'জন্য এখানকার সাক্ষীদের চরিত্র সম্বন্ধেও কিছুটা তদন্তের প্রয়োজন হয়। কারণ আমাদের যাবতীয় তদন্ত করে যেতে হবে তাদের কথা ভেবে যাদের কাছে শেষ বিচারের ভার আছে। তা'না হলে একটি মাত্র ভুলের জন্য আমাদের যাবতীয় পরিশ্রম একদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে। কোনও এক সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা পূর্বেই আমাদের জেনে নিতে হয়েছে। অবশ্য সমাজের বিভিন্ন স্তর আছে এবং উহার প্রতি স্তরের মানুষেরই একটি নিজস্ব মূল্য আছে। এ'কথা স্বীকার্য হলেও সাক্ষী—সমাজের কোন্ স্তরের ব্যক্তি তা জুরিদের পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেওয়া ভালো। অন্যথায় বিচারের সময় বিপরীত তথ্য প্রকাশ পেলে বিচারকমণ্ডলীর ভ্রান্ত ধারণা হওয়া অসম্ভব নয়।

আমরা সংবাদ নিয়ে জানলাম যে মণীন্দ্রবাবু হামেসা এখানকার নারীদের সংস্পর্শে এলেও নিজে তিনি একজন সাধু চরিত্রেরই লোক। এ'ছাড়া এ'ও জানা গেল যে এই ব্যায়ামবীরকে পল্লীর গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরা রীতিমত ভয় করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজে জেল-খাটিয়ে খোকা গুণ্ডার ভয়ে সর্বদাই ভীত ছিলেন। খুব সম্ভবত তিনি প্রাণভয়ের

কারণেই ঘটনাটি পুলিশের নিকট জানাতে পারেন নি। মণিবাবুর মত সাহসী ও শক্তিমান ব্যক্তিও যার ভয়ে সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত, সে যে একজন সহজ ব্যক্তি নয়, তা আমরা মণিবাবুর কথোপকথন হতে বুঝে নিতে পারলাম। এই সঙ্গে আমরা এ'ও বুঝতে পারলাম যে এখানকার ভীতা ত্রস্তা নারীরাও এই একই কারণে ঐ হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কোনও বিবৃতিই প্রদান করবে না। সকল দিক বিবেচনা করে সহকারীদের দূরের একটি মোড়ের নিকট অপেক্ষা করতে বলে আমি এবং সুনীলবাবু ছদ্ম-বেশে হত্যা সম্পর্কে কিছুটা গোপন তদন্তে মনোনিবেশ করলাম।

মণিবাবুর নিকট হতে এই তদন্ত সম্পর্কে নাকি-বীণার নামটা আমাদের শুনা ছিল। এই মেয়েটি তার টিকলো নাকের জন্য এ'পাড়ায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। নাকি-বীণা ২নং নীলমণি স্ট্রিটের একতলার দুইখানি ঘরে বাস করে। আমরা দুইজন জালবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করে ঐ বাটীতে প্রবেশ করি। প্রথমে নাকি-বীণার বাড়ির দুইজন ভৃত্যের সহিত সংলাপ শুরু করে দিলাম। ভৃত্যদ্বয় আমরা ইতিপূর্বে তাদের মনিবানী নাকি-বীণার নাম শুনিনি শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা তাদের হাতে একটি করে টাকা গুঁজে দিলে তারা খাতির করে আমাদের ঐখানকার একটি ঘরে বসিয়ে জানালো যে আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, কারণ তাদের গৃহকর্ত্রীর কক্ষে একজন ধনী জমিদার তখনও পর্যন্ত আলাপরত আছেন। আমরা এইবার আশ্বস্ত হয়ে ঐ ভৃত্য কয়জনের সহিত আলাপ-পরিচয়ে জেনে নিলাম যে সত্যই ঐরূপ একটি ঘটনা ঐদিন ঐ বাটীতে ঘটেছিল। তাদের বিবৃতির সংক্ষিপ্ত সারবার্তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"৪ঠা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা প্রায় ৮-৩০ সময় তারা দিদিমণির নির্দেশমত ছাদের উপর রসুই কার্য করছিল, এমন সময় একটা বিরাট হল্লা শুনে তারা নীচে নেমে এসেছিল। প্রথমে তারা মনে করেছিল উহা পুলিশের

গালা, কিন্তু নীচে এসে তারা দেখল তা নয়। প্রায় নয়জন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক দিদিমণির ঘরে ঢুকে পড়েছে। এদের মধ্যে একজন লোককে তারা ভালো করেই চিনতো। সেই লোকটি হচ্ছে এ'পাড়ার নামকরা তবলচিবাবু, পাগলাদা! তাদের মনিবানীর পা'দুটো জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠে বলছিল, 'নাকি! যদি পারিস তো বাঁচা আমাকে।' পাগলবাবুর কথায় দিদিমণি নিশ্চল মূর্তিতে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটিমাত্র কথাও তাঁর মুখ হতে বার হলো না। পাগলা কতো কান্নাকাটি এবং কতো আছড়া-আছড়ি করলো, কিন্তু কেউ তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলো না। পাগলা নাচার হয়ে ঘরের জানালার একটা রেলিঙ জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঐ লোকগুলো জোর করে তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে চেঙদোলা করে তুলে বাইরে এনে একটা ট্যাক্সির ভিতর বসিয়ে দিলে। আমরা মনে করছিলাম এদের ঐ অপকার্যে প্রাণপণে আমরা বাধা দেবো। এইজন্য মনিবানীর মুখের দিকে আমরা তাকিয়েও ছিলাম। কিন্তু উনি ইশারায় এইরূপ কার্য হতে আমাদের বিরত থাকতে বললেন। এর পর ট্যাক্সিখানা ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে গেলে আমাদের গৃহ-কর্ত্রী তাড়াতাড়ি সদর দরজাটা বন্ধ করতে বলে জানালেন যে ওদের সঙ্গে খোকা গুণ্ডা নিজে ছিল। এইজন্য আমরা তাদের বাধা না দিয়ে ভালো কাজই করেছি।"

রূপজীবিনী 'নাকি-বীণা' তখনও পর্যন্ত আপনার অর্গলবদ্ধ কক্ষে পেশারতা ছিল। এই অসময়ে তাকে আমরা বিরক্ত করবো কি'না ভাবছি, এমন সময় 'নাকি-বীণা' নিজেই তার কক্ষ হতে বার হয়ে এলো। বলা বাহুল্য যে পরিশেষে তার উন্নত নাসিকা আরও উন্নত করে তাকে তার ভৃত্যদেরই অনুরূপ একটি বিবৃতি দিতে হয়েছিল। এ'ছাড়াও 'নাকি-বীণা'র উপদেশানুযায়ী আমরা ঐ অঞ্চলে 'দিদি-ভাই' নামে পরিচিতা অপর আর এক মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ঐ

বাটীর দ্বিতলের একটি কক্ষেও গমন করি। ঐ কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র দেওয়ালে ঝুলানো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি সুবৃহৎ আলোক-চিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এ-ছাড়া ঐ ঘরটি সুদৃশ্য কোচ এবং অন্যান্য আসবাবপত্রে সজ্জিতও ছিল। তথাকথিত দিদিভাই নাম্নী মহিলাটি একজন শিক্ষিতা নারী। ইনি গ্রে স্ট্রিটের একটি বাটীতে পুত্র-কন্যাসহ বসবাস করলেও প্রতিদিন এই কক্ষে সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত কালাপহরণ করে থাকেন। বহু কৃষ্টিসম্পন্ন যুবক ঐ সময় এখানে এসে এঁর সঙ্গে সদালাপ করেন। এইজন্য এ-পাড়ায় তাঁর এই কক্ষটি এ-পাড়ার 'ওয়েসিস্' নামে পরিচিত।

দিদিভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নাকিবীণা এবং তার ভৃত্যদের বিবৃতির সমর্থন সূচক একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিই। উপরন্তু তাঁর নিকট হতে ঐ সময়ে ঐখানে উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজন কৃষ্টিসম্পন্ন ও আভিজাত্যসম্পন্ন ভদ্রসন্তানেরও নামধাম সংগ্রহ করে নিই। দিদিভাই-এর মতে ভদ্রসন্তান বিধায় লজ্জাবশত তাঁদের পক্ষে এ-পাড়ার কোনও ঘটনা বাহিরের কাউকে জানানো সম্ভব ছিল না। এরপর এইখানে অযথা আর কালহরণ করা আমাদের পক্ষে উচিত মনে হয় নি, কারণ এখানকার অন্যান্য সাক্ষীদের বিবৃতি পরবর্তীকালে কোনও এক সময় লিপিবদ্ধ করলে কোনও প্রকার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। এইজন্য ঐ স্থানে আর একটুমাত্রও অপেক্ষা না করে আমরা মলিনা নাম্নী অপর এক নারীর বাসস্থান অভিমুখে রওনা হলাম। সাক্ষী মণীন্দ্রবাবু তাঁর বিবৃতিতে এই মলিনার নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করেছিলেন।

আমরা এরপর দ্রুতগতিতে ৩২নং ইমামবক্স থানাদার লেনে শ্রীমতী মলিনা সুন্দরী দেবীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলাম। আমরা দেখলাম যে, ঐ বাড়ির বাসিন্দা প্রত্যেকটি নারী তখনও পর্যন্ত ভীতা ও সন্ত্রস্তা হয়ে রয়েছে। এমন কি খোকাবাবু নামটা পর্যন্ত তাদের হৃদয়ে

ভীতির সঞ্চার করে থাকে। দেখা গেল যে এরা মলিনা দেবীর কক্ষটি পর্যন্ত দেখিয়ে দিতেও ভয় পায়। বেশ বুঝা গেল যে খোকাবাবু এ-পাড়ায় সাক্ষাৎ যমরাজ অপেক্ষাও ভয়াবহ। আমাদের অবশ্য মলিনা দেবীর কক্ষটি খুঁজে বার করতে একটুমাত্রও দেরি হয় নি। কারণ আমাদের নিযুক্ত এ-পাড়ারই কয়েকজন ছদ্মবেশী প্রাইভেট গোয়েন্দা প্রয়োজন মত আমাদের গোপন সংবাদ সরবরাহের জন্য আমাদের আশে পাশে ঘোরা ফিরা করছিল। তাদের ইশারা পাওয়া মাত্র আমরা সদলে মলিনা দেবীর নির্দিষ্ট কক্ষে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু সেখানে মলিনা দেবীকে কোথাও পাওয়া গেল না। তবে মলিনা দেবীকে না পাওয়া গেলেও সেই কক্ষে তার মাতা সরোজিনী দেবীকে পাওয়া গেল। ঐ ঘরে তখন মলিনার মাতা সরোজিনী দেবী ট্রাঙ্ক বাক্স গুছিয়ে পুঁটলি-পোঁটলা বেঁধে ঐ সকল দ্রব্যসহ অন্য কোনও এক স্থানে সরে পড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ভাগ্যক্রমে আমরা ঠিক সময়ই ঐ স্থানে উপস্থিত হয়েছিলাম, তা না হ'লে আধ ঘণ্টার মধ্যে ঐ মহিলাটি কোনও এক অজ্ঞাত স্থানের উদ্দেশে রওনা হয়ে গিয়েছিল আর কি! এইজন্য দুরূহ মামলা সমূহের তদন্তকার্যে সফলতা লাভ করতে হ'লে সর্বাগ্রে স্পিড্ বা গতির প্রয়োজন হয়ে থাকে। এরপর আমরা মলিনা সুন্দরীর মাতা সরোজিনী দেবীকে একটু পীড়াপীড়ি করে নিম্নলিখিতরূপ জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই।

প্রঃ—তুমি তা'হলে মলিনার গর্ভধারিণী মা নও। তা' তাড়াতাড়ি এখন চলেছ কোথায়? এই সব পুঁটলি-পোঁটলা মেয়ের ঘর হতে তুমি চুরি করে পালাচ্ছ? সত্যি সত্যি সব কথার জবাব দাও, তা না হ'লে তোমাকে আমরা গ্রেপ্তার করব। তোমার উপর আমাদের ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে। এই সব দ্রব্য সরিয়ে নিয়ে যাবার অধিকার কে তোমাকে দিলে? তুমি তো দেখছি একজন মহা চোর। মেয়েটা

কোথায় বেড়াতে গেছে আর এই সুযোগে তুমি তার জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলছো, এঁ্যা ?

উঃ—এঁ্যা। কী বলছেন আপনজনেরা ? আমি গর্ভধারিণী না হ'লেও আমি তারই মা, বাবা। এই এতটুকু বেলা থেকে তাকে আমি মানুষ করেছি। মা কি মেয়ের জিনিস কখনও চুরি করে, বাবা! আমি মেয়ের কাছেই এই সব নিয়ে চলেছি। সে এখন আমার উত্তরপাড়ার বাড়িতে কিছুদিন থাকবে কিনা। ধকলে ধকলে বাছার শরীরটা বড্ড কাহিল হয়ে গেছে। তাই গাঁয়েঘরে গিয়ে বাছা একটু বিশ্রাম করবে।

প্রঃ—কি করে বুঝবো যে তুমি সত্যি কথা বলছো। মেয়ের জিনিস তো মেয়েই যাবার সময় নিয়ে যেতে পারত। এ নির্ঘাৎ কোনও প্রকারে চাবি সংগ্রহ করে বা ঝুটা চাবি তৈরি করিয়ে ওর নকল-মা সেজে তুমি এখানে জিনিসপত্র চুরি করতে এসেছ। তোমাকেই এই সব জিনিসপত্র সুদ্ধ আমরা এক্ষুনি থানায় নিয়ে যাব। তবে তোমার মেয়ে যদি বলে এ সব জিনিস তোমাকে সে নিয়ে যেতে বলেছে, তাহলে অবশ্য তোমাকে আমাদের ছেড়েই দিতে হবে।

উঃ—তা বাবা, এতোই যখন তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে, তখন তোমাদের একজন না হয় আমার সঙ্গে চলো। আমি তো এখান থেকে সোজা উত্তরপাড়ায় আমাদের বাড়িতেই যাবো। ওখানে গিয়ে আমার মেয়েকে না হয় কেউ জিজ্ঞেস করেই আসুন না, এ সব যা আমি বলছি তা সত্যি কথা, কি'না।

উপরের প্রশ্নোত্তর হতে বুঝা যাবে এই জিজ্ঞাসাবাদ ভারতীয় রক্ষীদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী করা হয়েছে। এই বিশেষ পদ্ধতিতে সরাসরি মূল ঘটনা সম্বন্ধে কখনও প্রশ্ন করা হয় না। বরং মানুষের মনকে বাক্-চাতুর্য সহযোগে কৃত্রিম উপায়ে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত করে পরে প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করে তাদের মনের কথা টেনে বার করে আনা হয়ে

থাকে। এইরূপ বাক্যজাল সাক্ষীদের স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। কারণ যে বাক্-প্রয়োগ স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রযোজ্য তাহা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি প্রযোজ্য হয় না। এইক্ষেত্রে মলিনার মাতা চুরির অভিযোগের কথাই ভাবছিল। ঐ সময় খুনের কাহিনী তার মনের মধ্যে স্থান পায় নি। তা না হ'লে এতো সহজে মলিনার মা আমাদিগকে মলিনার ঠিকানা না দিলেও না দিতে পারত।

উপরোক্ত মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে মলিনার মা সরোজিনীর মনের প্রতিরোধশক্তির হানি ঘটিয়ে তার স্বাভাবিক মনোবল ভেঙে দিয়ে তার নিকট হতে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতিও আমরা আদায় করে নিই।

"আমি মলিনা দেবীর পালিকা মাতা। কিছুকাল যাবৎ আমি উত্তর-পাড়ায় ঘর বেঁধে বাস করছি। আমার এই মেয়ের রূপের খ্যাতি আছে। সে নাচগান ভালো জানে। ছিনেমাতেও সে নাম করেছে। আজকাল আমায় সে ভাল মাসহারা দেয়। তাই এখন উত্তরপাড়ার গাঁয়ে-ঘরে বসে আমি শুধু ভগবানেরই নাম করি। তবে সে ব্যবসার জন্যে কোল-কাতাতেই থাকে। ৫ই সেপ্টেম্বর সকাল সাতটায় সে তার মানুষকে নিয়ে হঠাৎ উত্তরপাড়ায় আসে এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সেখানে সে কিছু-দিন থাকতে চায়! কিন্তু সে তার জিনিসপত্র উত্তরপাড়ায় নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। তাই তার জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্যে সে আমাকে তার চাবি দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।—না, না বাবা! মনের মানুষ কে কার কখন কি করে হয় তা মা' হয়ে আমি জানতে চাইব কেন? আজ্ঞে না, খোকাবাবু নামে কাউকে আমি চিনি না। তবে যে ভদ্রলোক মলিনাকে আমার বাড়িতে পৌছে দিয়ে গিয়েছে তাকে আমি নিশ্চয়ই চিনিয়ে দিতে পারবো।—আজ্ঞে হাঁ, সে কথা ঠিকই বলেছেন আপনারা। মলিনা মাস ছয় হ'লো আমার মাসহারা আশাতীতরূপে বাড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া পত্র দ্বারা সে এও জানিয়েছিল

যে ঐ সময় হতে তার আয় ঈশ্বরের কৃপায় তিন চার গুণ বেড়ে গিয়েছে।”

এরপর আর কালক্ষেপ না করে আমি উত্তরপাড়া অভিমুখে রওনা হয়ে যাওয়াই শ্রেয় মনে করলাম। ইন্সপেক্টার সুনীলচন্দ্র রায়কে অকুস্থলে আরও তদন্ত করার জন্য রেখে আমি একাকী মলিনার মা সরোজিনী সমভিব্যাহারে একখানি ট্যাক্সিযোগে উত্তরপাড়া অভিমুখে রওনা হলাম। উত্তরপাড়ার বাড়ির দালানে বসে মলিনা বিষণ্ণ মনে কি চিন্তা করছিল। এমন সময় তার মাকে নিয়ে আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। প্রথমে মলিনা খুন সম্পর্কে কোনও কথা বলতে চায় নি। কিন্তু পরে পীড়াপীড়ি করার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি প্রদান করে। তবে তার কথন-ভঙ্গি এবং মুখাকৃতি হতে বুঝা যায় যে, সে সত্য কথাই বলেছে।

“আজ্ঞে হাঁ! আমি একজন রূপজীবিনী নারী। আমার বর্তমান মাসিক আয় এগার বা বার শত টাকা। বর্তমানে এই টাকাটা আমার বর্তমান দয়িত খোকাবাবু একাই দিয়ে থাকেন। এছাড়া সিনেমা করে যা আমি পাই তা আমার ফালতু লাভ। খোকাবাবু আসলে কে এবং তিনি থাকেন কোথায়, কিংবা বর্তমানে ওঁর পেশা কি তা আমি জানিনা এবং কোনও দিন আমি তা জানবার চেষ্টাও করি নি। আমার সঙ্গে তাঁর টাকা নিয়ে সম্পর্ক। দেখ টাকা বন্ধ না করলে এসব প্রশ্ন আমাদের মনে উঠে না। কে ভালো আর কে মন্দ আমাদের মনে এসব প্রশ্নের ঠাঁই নেই। তবে এ'কথাও ঠিক যে ভাল লোক আমাদের নিকট কমই আসেন। ও-রকম মানুষ দু'একজন এলেও তাঁরা বেশিদিন ভাল থাকতে পারেন না। আজ্ঞে হাঁ, মাত্র ছয় মাস হলো খোকাবাবু কেবল আমার ঘরেই আসছেন। তাঁর সঙ্গে আমার শর্ত আছে এই যে আর কেউ আমার কাছে আসতে পারবে না। ওঁর সঙ্গে যারা আমার

ঘরে গান শুনতে আসেন, তাঁরাই ওঁকে 'খোকাবাবু, খোকাবাবু' বলে ডাকেন। এইজন্য আমার কাছেও উনি ঐ নামে পরিচিত। আজ্ঞে হাঁ, মাঝে মাঝে আমার ঘরে গানের মহড়া হলে পাগলাবাবু বলে একজন তবলচি সেখানে তবলা বাজিয়ে যায়। হাঁ, খোকাবাবুর জামানাতেও কয়েকবার তিনি আমার ঘরে তবলা বাজিয়ে গেছেন। হাঁ, এ কথা সত্য যে, খোকাবাবু মধ্যে মধ্যে কয়েকদিন পর্যন্ত উধাও হয়ে থাকতেন। ঐ সময় চেষ্টা করলেও তাঁর কোন খোঁজ বা খবর পাওয়া যেত না। জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানাতেন, কাজকর্মে তাঁকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়। আজ্ঞে হাঁ! চার দিন উধাও হয়ে থাকার পর ৫ই সেপ্টেম্বর ভোর ছয়টার সময় তিনি হঠাৎ আমার নিকট এসে বললেন যে সেই দিনই তাঁকে বিদেশে যেতে হবে। ফিরতে তাঁর প্রায় দুই মাস সময় লাগবে এই জন্য তিনি আমায় আমার মার কাছে রেখে যেতে চাইলেন। বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় আমি তখুনি তাঁর সঙ্গে মার কাছে চলে আসি। পরে খোকাবাবুর উপদেশ মত মাকে আমার ব্যবহার্য জিনিসপত্র আনতে কোলকাতায় পাঠাই। পাছে খোকাবাবুর অবর্তমানে আমি আর কাউকে কামনা করি, এইজন্যই বোধ হয় তিনি আমাকে আর একটুক্ষণও ওখানে থাকতে দিলেন না। আমি খোকাকে ভালবাসি কি'না তা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। তবে খোকা আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে বলে মনে হয়। আজ্ঞে হাঁ, ঠিকই বলেছেন। আমরা ভালবাসা বিক্রিই করে থাকি। তবে কখনও কখনও ওটা দান যে একেবারেই করি না, তা'ও নয়। না না না, আমাকে আপনারা মাপ করবেন। এ'ছাড়া আর আমি কিছু আপনাদের বলতে পারব না।"

বেশ বুঝা গেল যে মলিনা সুন্দরী প্রকৃত তথ্য গোপন করছে এবং সে ইচ্ছা করেই সত্য কথা বলতে চায় না। এ অবস্থায় মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা প্রকৃত সত্য তার কাছ হতে বার করা ভিন্ন

উপায়ও ছিল না। পরিশেষে আমরা তাঁকে নিম্নোক্তরূপে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই। একটা কিছু অঘটন ঘটার জন্যই যে খোকাবাবু মলিনাকে শহর হতে সরিয়ে দিয়েছে, এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি মলিনা সুন্দরীর নিশ্চয়ই আছে। এইরূপ মানসিক অবস্থার মধ্যে পুলিশের উপস্থিতি তাকে যে ভীতা ও সন্ত্রস্তা করে তুলবে তাতে আর বিচিত্র কি? এইজন্য পরামর্শদাতার অভাবে তার মত একটি নারীর মনোবল যে সহজেই ভেঙ্গে পড়বে তাতে আর আমার সন্দেহ ছিল না। নিম্নে উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তর হতে আমার আশা যে অমূলক ছিল না তা নিশ্চিতরূপে বুঝা যাবে।

প্রঃ—খোকাবাবুর দোস্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তবে আমি তোমার কাছে এসেছি। কোলকাতায় খোকাবাবু কি করেছেন বা না করেছেন তা তুমি যে একটুও জানো না, তা নয়। তবে খুনের সঙ্গে তুমি যে সাক্ষাৎ ভাবে জড়িত নও তা আমি বিশ্বাস করি।

উঃ—এঁ্যা খুন? কি বলছেন আপনি! কে কা'কে খুন করলো? বলুন না, বলুন না; কে খুন হয়েছে। আমি খুনের কথা কিছু জানি না।

প্রঃ—জানো না মানে? খোকাই তো পাগলাকে খুন করেছে। খোকাকে তুমি কতটুকু ভালবাস তা জানি না, কিন্তু তুমি যে পাগলা-বাবুকে সত্যসত্যই ভালবাসো তা আমরা ভালরূপেই জানি। জানো, আজ তোমার জন্যই পাগলাকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো। তার একমাত্র অপরাধ ছিল, সে তোমাকে ভালবাসতো। এখনও যদি তুমি মিথ্যা কথা বলো কিংবা সত্য গোপন করো তা'হলে পাগলার অমর-আত্মা তোমাকে ক্ষমা করবে না।

আমরা খুনের কারণ সম্পর্কে কেবলমাত্র যা অনুমান করেছিলাম তাই কেবল আমি মলিনাকে বলেছিলাম। কিন্তু আমাদের এই ব্যাখ্যা বারুদের স্তূপে যেন অগ্নি সংযোগ করে দিলে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম,

মলিনা অঝোরে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। লৌহ তপ্ত থাকতে থাকতেই তাতে ঘা দেওয়ার রীতি আছে। তাই আর দেরি না করে আমি মলিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে নিলাম।

"আজ্ঞে, আজ আমি কোনও কথাই আর গোপন করবো না এ কয়দিন আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে, প্রকৃতপক্ষে কাকে আমি ভালবাসি, নির্ধন সহায়-সম্বলহীন পাগলাবাবুকে, না ধনী-সুপুরুষ খোকাবাবুকে। আজ আর স্বীকার করতে বাধা নেই যে, আমি পাগলাকেই বেশি ভালবাসতাম। আমি যদি জানতাম যে খোকা এই ভাবে তাকে খুন করবে তা'হলে কি খোকাকে আমি আমার ঘরে স্থান দিই! তবে এ'ছাড়া আমার অন্য কোনও উপায় ছিল না। খোকাকে আমি স্থান না দিলে পাগলাকে সে এর আরও আগে খুন করে আসতো। তার পথের কোনও বাধা বা কাঁটাকে সে কোনও দিনই ক্ষমা করে নি। এইবার হয়তো সে আমাকেই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। খোকাবাবু যে কী ভীষণ দুর্দান্ত লোক তা আমার চেয়ে বেশি আর কেউই জানে না।

আজ্ঞে হাঁ, আমি যা জানি তা নিশ্চয় বলবো। মাঝে মাঝে খোকার ভয়ে পাগলা যে গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করতো একথা সত্য। প্রকৃতপক্ষে তারই চেষ্টায় আমি গানবাজনা শিখতে পেরেছি। মাত্র কয়েকদিন আগে খোকা আমার ঘরে পাগলাকে দেখে তাকে ঘাড় ধরে বার করে দেয়; আর আমায় সাবধান করে দিয়ে বলে যে, আমি যেন আর একটি দিনও তাকে আমার ঘরে আসতে না দিই। পাগলা এই দিন একটু মদ খেয়েই এসেছিল। অপমানিত হয়ে চলে যেতে যেতে সেও খোকাকে শাসিয়ে যায় এই বলে—'তুমি যে একজন জেলা-খারিজ গুণ্ডা তা আমি জানি। দেখো, কালই আমি তোমাকে গোয়েন্দা-পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে দেবো।' এর কয়দিন পর একদিন রাত্রে খোকা আমার

ঘরে বসেছিল। এমন সময় সাদা পোশাকে দুইজন পুলিশ আমার দরজায় এসে খোকার খোঁজ করতে থাকে। আমি দরজার ফুটো দিয়ে সিপাই দু'জনকে দেখে খোকাকে তাদের আগমন বার্তা জানিয়ে দিই। খোকা-বাবুও তৎক্ষণাৎ দ্বিতলের জানালার গরাদ সরিয়ে একলাফে নীচের রাস্তার উপর নেমে চক্ষের পলকের মধ্যে উধাও হয়ে যায়। পরে আমি শুনেছি পাগলাবাবু পুলিশে খবর দেয় নি। সিপাই দু'জন অন্য সূত্র হতে সংবাদ পেয়ে সেখানে এসে গিয়েছিল। কিন্তু খোকাবাবু এজন্য একমাত্র পাগলাবাবুকেই পুলিশের সংবাদদাতারূপে সন্দেহ করেছিল।

এর পরে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি নয়টার সময় আমার ঘরে বসে আছি এমন সময় খোকাবাবুর বন্ধু কালী এসে বললো, 'বৌদি! খোকা এখুনি তোমাকে আমার সঙ্গে আসতে বললো।' এই বলে কালীবাবু আমাকে নিয়ে গিয়ে সোনাগাছির উষা নামে একটি মেয়ের বাড়িতে তুললো। এর পর রাত প্রায় দশটার সময় খোকাবাবু তাঁর বন্ধু কেষ্ট-বাবুকে সঙ্গে করে উষার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো। এই সময় আমি খোকার নীল রঙের শার্টের উপরে দু'এক জায়গা লাল রঙে রঞ্জিত দেখি। আমি ঐ লাল রঙের দাগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে খোকা বললো, 'ও না না, ও কিছু না রে! ও পানের পিচ লেগেছে।' এই কথা বলে খোকাবাবু তার বন্ধু কেষ্টবাবু এবং কালীবাবুকে নিয়ে পুনরায় কোথায় চলে গেল। তার পর রাত প্রায় দেড়টার সময় খোকা-বাবু পুনরায় আমাদের নিকট ফিরে আসে। এই সময় আমি লক্ষ্য করি যে খোকাবাবু চান করে মাথায় গন্ধ তেল দিয়েছে। এছাড়া সে তার নীল শার্টটা বদলে একটা ছাই রঙের পাট-ভাঙা নূতন শার্ট পরে নিয়েছে। এর একটু পরে খোকার অপর এক বন্ধু ভূপেনবাবুও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ঐ উষা নামের মেয়েটি ছিল ভূপেনেরই রক্ষিতা। এরপর সারা রাত ধরে বসে বসে আমরা সেখানে বিয়ার খাই এবং

সেই সঙ্গে বহু গল্প-গুজবও করি। পরদিন প্রত্যুষে ছয়টায় খোকাবাবু আমাকে জানালো যে তার নামে একটা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়েছে। এইজন্য কিছুদিনের মত সে কলকাতার বাইরে গিয়ে গা' ঢাকা দেবে। এই বলে সে আমাকে সোজা উত্তরপাড়ায় এনে আমার মা'র কাছে রেখে দিয়ে যায়। আমি সময়ের অভাবে আমার বাড়ি হয়ে আসতে পারিনি। এইজন্য আসবাবপত্র আনার জন্য মাকে কোলকাতায় পাঠাতে হয়েছিল। খোকাবাবু এখন কোথায় আছেন তা আমি জানি না। তবে আমি আপনাদের সোনাগাছিতে ঊষার বাড়িটা দেখিয়ে দিতে পারবো।"

এরপর আমি যে ট্যাক্সিতে উত্তরপাড়ায় গিয়েছিলাম সেই ট্যাক্সিতেই মলিনাকে নিয়ে কলকাতায় ঊষার বাড়িতে এসে উপস্থিত হই। এই সময় ঊষার দয়িত ভূপেনবাবুকেও ঊষার ঘরে আমি দেখতে পাই। আমাদের দেখামাত্র ভূপেন সরে পড়বার চেষ্টা করছিল; কিন্তু পালাবার পূর্বেই আমরা তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলি। তাকে গ্রেপ্তার করতে আমাদের বেশি বেগ পেতে হয় নি। এইজন্য তাকে একজন দুর্দান্ত প্রকৃতির ব্যক্তি ব'লে আমাদের মনে হলো না। ভূপেনের রক্ষিতা ঊষাকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে মালনা দেবীর অনুরূপই এক বিবৃতি দিয়েছিল। এর অধিক তার পক্ষে এই হত্যা সম্পর্কে অবগত থাকাও সম্ভব ছিল না। তবে তার দয়িত ভূপেনের নিকট হতে খুন সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া গেলেও যেতে পারে ব'লে আমাদের মনে হয়েছিল। এইজন্য বিশেষ করে ভূপেনকেই এই হত্যা সম্পর্কীয় একটি বিবৃতি দিবার জন্য আমি পীড়াপীড়ি করতে থাকি। এই সম্পর্কে ভূপেনের নিকট হতে প্রাপ্ত বিবৃতিটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি আমার রক্ষিতা ঊষার সহিত তার ঘরেতেই বাস করি এবং বাজারে পাটের দালালী দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করি। খোকাবাবু এবং

তার বন্ধু কেষ্ট, গোপী, কালী এবং সুবলবাবুর সঙ্গে আমার এই পাড়াতেই আলাপ হয়। আমরা কয়জন প্রায়ই সন্ধ্যাকালে নিকটস্থ স্কোয়ারে ব'সে আলাপ আলোচনা করতাম। কিন্তু এই কয় ব্যক্তি যে কোথায় থাকে এবং তারা যে কি করে তা তারা কোনও দিনই আমায় বলে নি। তবে মধ্যে মধ্যে তারা আমার রক্ষিতা উষার ঘরে এসে বিয়ার খেয়ে গিয়েছে। আজ্ঞে হাঁ, ৪ঠা সেপ্টেম্বরও রাত আন্দাজ নয়টার সময় এদের কয়েকজন উষার ঘরে বসে বিয়ার খেয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঐ সময় তারা খোকার রক্ষিতা মলিনাকে কেন উষার ঘরে এনেছিল তা আমার জানা নেই। ঐদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে দেখি খোকা, কালী এবং কেষ্ট আমার ঘরে বসে জটলা করছে। ঐরাত্রে একটু বেশি মদ খাওয়ায় আমি আক্রান্ত হয়ে স্কোয়ার মাঠেই ঘুমিয়ে পড়ি। এই জন্যই বাড়ি ফিরতে আমার অতো বেশি রাত হয়ে গিয়েছিল।"

মলিনা দেবীর বিবৃতি অনুযায়ী আমরা তদন্ত করে জানতে পারি যে কলিকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগের গুণ্ডা শাখার দুইজন সিপাই কোনও এক সংবাদ অনুযায়ী খাঁদা নামে একজন জেলা-খারিজ (Externed) গুণ্ডার খোঁজে সত্য সত্যই মলিনার ঘরে ঐ দিন হানা দিয়েছিল। তবে ঐখানে খাঁদার অবস্থান সম্বন্ধে কোনও সংবাদ পাগলাবাবু তাদের দেয়নি। এ'ছাড়া এ'ও জানা যায় যে ঐ সময় বরাবর খোকাবাবুর বন্ধু কেষ্টকেও মাতাল অবস্থায় রাস্তা হতে বটতলা থানার জনৈক কনস্টেবল পাকড়াও করে নিয়ে যায়। কেষ্টকে একটি পেটিকেসে আদালতে সোপর্দ করাও হয়েছিল। আদালতের বিচারে কেষ্টর দশ টাকা জরিমানা হয়। এই দুইটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা পাগলাবাবুর সহিত সম্পর্ক রহিত হলেও খোকাকে যেদিন সে ধরিয়ে দেবে ব'লে শাসিয়েছিল তার একদিন পরেই সংঘটিত হয়। এইজন্যই বোধ হয় খোকাবাবু এবং তার বন্ধু কেষ্ট-

বাবুর ধারণা হয়েছিল যে পাগলাই তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তাদের সম্বন্ধে বারে বারে পুলিশে সংবাদ দিচ্ছে।

কোনও একটি হত্যার মামলা প্রমাণ করতে হলে প্রথমেই প্রমাণ করতে হয় যে ঐ হত্যা কাণ্ডটি কি উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে। ইংরাজিতে একে বলা হয় মোটিভ। এই মোটিভ বা উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে না পারলে মূল হত্যাকাণ্ডটিও প্রমাণ করা শক্ত হয়ে পড়ে। এক্ষণে উপরোক্ত দুইটি বিভিন্ন ঘটনা হতে আমরা বুঝতে পারি যে পাগলা খোকাবাবুকে পুলিশে ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়ে আসার একদিন পরে খোকার ঘরে গোয়েন্দা পুলিশ হানা দেওয়ায় খোকাবাবুর ধারণা হয়েছিল যে তাহ'লে পাগলাবাবুই তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য খোকাবাবুর আস্তানা সম্বন্ধে পুলিশকে খবর দিয়েছে। এ'ছাড়া প্রথম ঘটনার দুই একদিন পরে খোকার অকৃত্রিম বন্ধু কেষ্টবাবুকে বটতলার পুলিশ অন্য এক কারণে রাস্তা হতে ধরে নিয়ে গেলেও খোকাবাবু ও কেষ্টবাবুর ধারণা হয়েছিল যে কেষ্টবাবুর এই গ্রেপ্তারের পিছনেও পাগলাবাবুরই কারসাজি ছিল।

এরপর আমরা সন্দেহক্রমে উষার দয়িত ভূপেনকে গ্রেপ্তার করে থানায় আনি। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও অন্য কোনও আসামীকে আমরা ঐ রাত্রে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হইনি। এই সময় আমরা বুঝতে পারি যে এই কালী ও ভূপেনও এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। তবে এদের চাইতেও অধিকতর দুর্দান্ত প্রকৃতির আরো কয়েকজন ব্যক্তি যে এই হত্যাকাণ্ডে খোকাবাবুর সহকারী ছিল তাও আমরা সহজে বুঝে নিতে পেরেছিলাম।

এইদিন অধিক রাত্রি হয়ে যাওয়ায় মলিনাকে তার কলিকাতার নিজ বাড়িতে রেখে আমরা আমাদের থানায় ফিরে আসি। কিন্তু পাছে মলিনাকে খাঁদা পুনরায় সেখান থেকে সরিয়ে নেয় সেইজন্য সতর্কতা-

মূলক ব্যবস্থা স্বরূপ মালনা সুন্দরীর গৃহে আমরা সাদা পোশাকে দুই-জন পুলিশ মোতায়েন করতেও ভুলিনি। কারণ যে নারীটিকে নিয়ে এই হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছে তাকে খোকাবাবু সত্য সত্যই অন্তরের সহিত ভালবাসতো। এই অবস্থায় খোকাবাবুর পক্ষে পুলিশের অবর্ত-মানে তাহার সহিত মিলিত হবার চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক ছিল।

এর পর দিন ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬, তারিখে প্রত্যূষে আমরা স্ব স্ব নির্দিষ্ট কোআর্টার্স থেকে নেমে থানার অফিসঘরে এসে সমবেত হলাম। বস্তুতপক্ষে ভোর রাত্রে বাড়ি ফিরলেও আমরা কেহই ঘুমাতে পারিনি। বরং ঘুমের আমেজের ফাঁকে ফাঁকে আমরা এই হত্যা-কাণ্ডটি সম্বন্ধেই চিন্তা করেছি। কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সুনীলবাবু প্রস্তাব করলেন যে আমাদের এখন উচিত হবে পুনরায় সোনাগাছির বেশ্যাপল্লীতে উপস্থিত হয়ে সেখানকার বাড়িতে বাড়িতে আরও তদন্ত চালিয়ে যাওয়া। এইরূপ তদন্ত দ্বারা যে কয়টি বেশ্যানারী কোনও দিন না কোনও দিন পাগলাবাবুর সংস্পর্শে এসেছে তাদের খুঁজে বার করার আশু প্রয়োজনও আমাদের ছিল। সুনীলবাবুর উপদেশ মত আমরা পুনরায় সোনাগাছি অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে সেখানকার বাড়ি বাড়ি তদন্ত করে প্রায় বাইশজন কুলটা নারীকে সংগ্রহ করলাম। তদন্ত দ্বারা জানা গেল যে ওরা সকলেই ভালরূপে পাগলাবাবুকে বহুবার দেখেছে। এদের সহিত আমরা উষা, মলিনা এবং মৃতের অন্যান্য পরিচিত ব্যক্তিদেরও সঙ্গে নিলাম। এদের সকলকে সঙ্গে করে কলিকাতার পুলিশ-মর্গের বরফ ঘরে এনে তাদের একে একে পাগলার মৃতদেহটি দেখাতে শুরু করলাম। সৌভাগ্যের বিষয় যে ঐ মুণ্ডবিহীন দেহটি পাগলার বলে এরা সকলেই সনাক্ত করেছিল। মুণ্ডবিহীন দেহ সনাক্ত করা যে খুবই কঠিন তা সর্বদাই স্বীকার্য।

কিন্তু নিম্নোক্ত কয়টি বিশেষ চিহ্ন হতে তাদের পক্ষে ঐ মৃতদেহটি বিশ্বাসযোগ্যরূপে সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল।

(১) মৃতদেহটির বুকে ও পিঠে প্রচুর চুল ছিল। দারুণ মাতাল অবস্থায় তাকে তারা প্রায়ই নগ্ন অবস্থায় পথে-ঘাটে পড়ে থাকতে দেখতো। এইজন্য এই সব বৈশিষ্ট্য দেখার সুবিধা তাদের হয়েছিল।

(২) মৃতদেহটির বাম হাতে একটি ফুলের কুঁড়ি উল্কি সহযোগে অঙ্কিত ছিল। এ'ছাড়া তার বাম কাঁধে একটা গভীর ক্ষতও দেখা যেতো। পাগলাবাবুর দেহের এই সব চিহ্নগুলি এরা প্রায়ই দেখেছে।

(৩) মৃতদেহের বাম পা'টি কৃশ পা ছিল এবং উহার ডান পায়ে ত্রিশূলের মত একটি দাগ ছিল। এই রকম পা সাধারণত মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

(৪) মৃতদেহের মাপ, আকৃতি এবং গাত্রবর্ণ হতেও উহা পাগলা-বাবুর মৃতদেহ বলে তারা সনাক্ত করতে পেরেছিল। এই পাগলাবাবুকে বারে বারে তারা দেখেছে। এইজন্য এই সম্বন্ধে তারা কোনওরূপ ভুল বা ভ্রান্তি করতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত আমরা পাগলার মৃতদেহের ওজন ও মাপও নিয়েছিলাম। কারণ কোনও দর্জির কাছে জামার মাপ দেওয়া কিংবা কোনও স্থানে তার দেহ ওজন করানোও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। উপরন্তু তার পদ-চিহ্ন এবং হস্তাঙ্গুলির চিহ্নও আমরা গ্রহণ করেছিলাম। কারণ কোনও থানায় ধরা পড়ার পর জামিনের কাগজে তার পক্ষে টিপ দেওয়াও অসম্ভব দিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই কয়েকটি সূত্র অনুযায়ী তদন্ত করে আমরা কোনও সুফল পাইনি।

ইতিমধ্যে আমাদের একজন অফিসার পাগলাবাবুর এক ভাইকে খুঁজে বার করতে পেরেছিল। এই ভদ্রলোক বনগাঁয়ে ডাক্তারি করতেন।

এইদিন ইনিও এসে মৃতদেহটি তাঁর বিগতপ্রাণ কনিষ্ঠ ভ্রাতার বলে সনাক্ত করে গেলেন। ভদ্রলোকটির নিকট হতে আমরা জানতে পারি যে, পাগলাবাবুর প্রকৃত নাম প্রতুলবাবু এবং সে সত্যই একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। কিন্তু কুলটা নারীদের গানবাজনা শেখাতে এসে সঙ্গ দোষে ধীরে ধীরে সে অধঃপাতের শেষ সীমায় নেমে এসেছে।

এক্ষণে আমাদের বিবেচনার বিষয় হলো যে উপরোক্ত কয়টি মাত্র চিহ্ন হতে ঐ মৃতদেহ পাগলা ওরফে প্রতুলবাবু নামে এক ব্যক্তির মৃতদেহরূপে সনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে কি'না। এই বিষয়ে শেষ বিচারের ভার জজ ও জুরিদের ধ্যান-ধারণার উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে। এইজন্য এই বিষয়টি নিয়ে আর অধিক মাথা ঘামানোর আমরা প্রয়োজন মনে করিনি।

ইতিপূর্বেই আমরা পুলিশ সার্জেনের নিকট লাসচেরাই-এর বা পোস্টমর্টেম পরীক্ষার রিপোর্ট পেয়েছিলাম। রিপোর্টটিতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নোক্তরূপ তথ্যটিও লিপিবদ্ধ ছিল। এই বিশেষ তথ্যটির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালীন তদন্ত করবার জন্য ঐ রিপোর্টের এই অংশটি আমরা মনোযোগ সহকারে আর একবার পাঠ করে নিলাম—

"আমি পরীক্ষা দ্বারা আরও জেনেছি যে রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা আন্দাজ সময়ে প্রথমে এই ব্যক্তিকে ছুরিকা দ্বারা বার বার আঘাত করে মৃতপ্রায় করে ফেলা হয়। কিন্তু তখনও এই ব্যক্তির প্রাণ দেহ হতে বিচ্যুত হয়নি। এর কিছু পরে তার জীবিত অবস্থায় তার দেহ হতে মুণ্ডটি ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে বিচ্ছিন্ন করে তাকে নিহত করা হয়েছিল।"

সবদিক বিবেচনা করে আমরা প্রায় সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সমর্থ হই যে—কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময় কার দ্বারা কি কারণে এবং কবে ও কি কি উপায়ে কোথায় নিহত হয়েছিল। বস্তুতপক্ষে এইভাবে আমরা

এই হত্যা রহস্যের উপর প্রচুর আলোকপাত করতে পারায় আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলাম। এই অবস্থায় আমাদের দলের কোনও কোনও অফিসার মতপ্রকাশ করলেন যে আজকের মত তদন্ত এইখানেই সমাপ্ত করা যাক। কারণ আমরা সকলে এই দুইদিন যাবৎ ঘোরাঘুরি করে সত্যসত্যই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। প্রকৃতপক্ষে মানুষের দেহ যতটা সইতে পারে তাকে তার বেশি সওয়াতে গেলে তা সহজেই ভেঙ্গে পড়তে পারে। একথা নিশ্চয়ই সত্য যে নিজেদের দেহ ও মনকে সুস্থ না রাখলে কোনও দুরূহ কার্যে সফলতা লাভ করা অসম্ভব। কিন্তু তা সত্বেও আমি আমার সহকারী তদন্তকারীদের সহিত এক-মত হতে পারিনি। আমার মতে তদন্তের সাফল্য একান্তরূপে নির্ভর করে স্পিড্ বা গতির উপর। অন্যথায় বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ ইতিমধ্যেই বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ'ছাড়া বিলম্বের কারণে মূল হত্যাকারী পুলিশের নাগালের বাইরে চলে গেলে কয়েক বৎসর পর্যন্ত তার পক্ষে ফেরার জীবন অতিবাহিত করা সহজসাধ্য হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে বহু প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকেও নানা কারণে আর খুঁজে পাওয়া না'ও যেতে পারে। এইজন্য আসামী বহু বৎসর পরে ধরা পড়লেও তাদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত আর মামলা পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। এই বিষয় কয়টি ছাড়া আমার সহকারী অফিসারদের সহিত দ্বিমত হওয়ার অপর আর একটি কারণও ছিল। এই কারণটি হচ্ছে এই যে আমার স্থির বিশ্বাস ছিল খোকাবাবু এইদিনই গভীর রাত্রে তার রক্ষিতা মলিনা সুন্দরীর কক্ষে নিশ্চয়ই একবার হানা দেবে। এইজন্য আমার সহকারীদের বিশ্রাম করবার সুযোগ দিয়ে আমি একাই কয়েকজন সিপাহীসহ মলিনা সুন্দরীর বাটীর নিকট গোপনে অবস্থান করতে মনস্থ করলাম। বলা বাহুল্য যে আমাদের অভিজ্ঞ পুরাতন ইনস্পেক্টার সুনীলবাবু আমার মতেই মত দিয়েছিলেন। অগত্যা এই দুরূহ কার্য

সম্পন্ন করার ভার স্বেচ্ছাকৃতভাবে আমি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছিলাম। কিন্তু এতে যে নিজের জীবন কতদূর বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে তা তখনও আমি অনুমান পর্যন্ত করতে পারিনি।

আমি কয়েকজন মাত্র সিপাহী সমভিব্যাহারে সাদা পোশাকে মলিনা সুন্দরীর বাটীর নিকট যখন পৌছিলাম, তখন রাত্র প্রায় দুইটা বাজতে চলেছে। হঠাৎ আমরা সন্ত্রস্ত হযে লক্ষ্য করলাম দিকে দিকে ঐ অঞ্চলের নিশাচর লোকেরা এবং স্থানীয় দোকানদারেরা ভীত ত্রস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে। সকলের মুখে সেই একই কথা "খোকা—খোকা—খোকা।" এই সময় তাদের সমবেত কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে মলিনা সুন্দরীর ঘর থেকে করুণ আর্তনাদ শোনা গেল, "ওরে বাবারে—মেরে ফেললে রে। ওগো তোমরা কে কোথায় আছো-ও, শীঘ্র এসে আমায় রক্ষা করো গো—"। মলিনা সুন্দরীর বাটীর নিচের ঘরে দুইজন পাহারাদার পাহারার জন্য পূর্ব হতেই মোতায়েন ছিল। ইতিমধ্যে কে বা কাহারা বাহির হতে তাদের দরজা শিকলের সাহায্যে বন্ধ করে দিয়েছিল। ঐ ঘরের ভিতর হতে তারাও প্রাণপণে চীৎকার করে সাহায্য ভিক্ষা করছিল। এই সময় বটতলা থানার সেকেণ্ড অফিসার আসিরুল হক সাহেব এলাকায় রোঁদ দিতে দিতে ঐখানে এসে পড়েছিলেন। তিনি অকুস্থলে জমায়েৎ ভিড়ের ওপার থেকে প্রাণপণে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত লোকের ভিড়ের চাপে কিছুতেই তিনি এগিয়ে আসতে পারছিলেন না। এমন সময় হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম, মলিনা দেবীর বাড়ির দোতালার কার্নিশ থেকে এক ব্যক্তি পিস্তল হাতে লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে চতুর্দিকের জনতা'কে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি গুলি বর্ষণ শুরু করে দিলে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমারও জামার নিচেকার পেটিকায় গুলিভরা একটি পিস্তল ছিল। আমিও তৎক্ষণাৎ উহা বার করে ঐ লোকটিকে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি কয়েকবার গুলি ছুঁড়লাম।

কিন্তু সম্মুখের জনতার জীবন পাছে অকারণে বিপন্ন হয় সেইজন্য আমাকে শীঘ্রই সংযত হয়ে গুলিবর্ষণে বিরত হতে হলো। এই সুযোগে লোকটি পাশের অপরিসর গলি দিয়ে কোথায় যে উধাও হয়ে গেল তা জনতার আর সকলের মত আমিও বুঝতে পারলাম না। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে বটতলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার যতীন্দ্র মুখার্জি বহু সিপাহী-শাস্ত্রীসহ সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। এই খবর শ্যামপুকুর থানাতেও পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। সেইখান হতে ইনস্পেক্টার সুনীলবাবুও তাঁর অন্যান্য সহকারীদের সহিত ত্বরিত গতিতে অকুস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা সকলে মিলে দ্রুতগতিতে সারা সোনাগাছি অঞ্চলটিই ঘেরোয়া করে ফেলে সেখানকার প্রতিটি বাটীর প্রতিটি কক্ষ এবং তৎসহ চতুর্দিককার মেথরগলি ও রাজপথসমূহে তন্ন তন্ন করে ঐ আততায়ীর জন্য খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া তো গেলই না, এমন কি কোন পথ দিয়ে যে ঐ ব্যক্তি অন্তর্ধান হয়ে গেল তার সামান্য হদিস পর্যন্ত কেউই আমাদের জানাতে পারলো না।

এরপর আমরা সকলে মিলে খোকাবাবুর রক্ষিতা মলিনা সুন্দরীর কক্ষে এসে দেখলাম মলিনা সুন্দরী আপন কক্ষে বসে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। তার পাশে পড়ে রয়েছে একটা শক্ত মোটা দড়ি ও একটি ক্লোরোফর্ম ভর্তি শিশি। এই ঘটনা সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে একটি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দিয়েছিল। তার সেই বিবৃতির একটি সারমর্ম নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"এই রাত্রে আমি নিশ্চিন্ত হয়েই আপন কক্ষে নিদ্রিত ছিলাম। কারণ আমি জানতাম যে নিচের ঘরে দুইজন সিপাই আমাকে রক্ষার জন্য উপস্থিত আছে। সহসা জানালা ভাঙার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের

মধ্যে একটা ঝুপ করে আওয়াজ হলো। এইরূপ একটা আওয়াজ শুনা মাত্র আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু আমি উঠে বসবার পূর্ব্বেই দেখি আমার ঘরের বিজলী বাতিটি জ্বেলে দিয়ে খোকাবাবু আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠা মাত্র খোকাবাবু আমাকে চুপ করে থাকবার জন্য নির্দেশ দিলেন। তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা ভিন্ন আমার উপায়ও ছিল না। খোকাবাবু এরপর প্রস্তাব করলেন যে তিনি আজই আমাকে বাঙলা-দেশের বাইরে একস্থানে নিয়ে যাবেন। আমি সভয়ে তাঁকে জানালাম যে এতে তাঁর বিশেষ বিপদ ঘটতে পারে। কারণ নিচে দুয়ারের কাছে দুই জন পুলিশের লোক আমাকে রক্ষা করার জন্য মোতায়েন করা আছে। ইতিমধ্যে খোকার বন্ধু কেষ্টবাবুও ঐ একই পথে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমার কথা শুনে তিনি বললেন যে, ঐ সিপাহীদ্বয়ের ঘর বাহির হতে অতর্কিতে তিনি শিকল তুলে বন্ধ করে দিয়েছেন। ঠিক এই সময় নিচেকার সিপাহীদ্বয়ও বাহিরের ব্যাপার উপলব্ধি করে চীৎকার শুরু করে দিলে। তাদের চেঁচানিতে বিরক্ত হয়ে খোকাবাবু তার সাকরেদ কেষ্টবাবুকে জানাল, 'এই তুই শীগ্রি নিচে নেমে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়া। মলিনা সহজে আমাদের সঙ্গে যেতে রাজি হবে বলে মনে হচ্ছে না। আমি একে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করে ওর দেহটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিচে গলিটায় নামিয়ে দেবো, আর নিচে থেকে তুই ওকে ধরে ফেলে বাঁধনটা তাড়া-তাড়ি খুলে দিয়ে ওকে কাঁধে করে নিয়ে চলে যাবি। ঐ গলির অপর মুখে এতক্ষণে সুবল নিশ্চয়ই মণ্টুদের ট্যাক্সিখানা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।' খোকার আদেশ পাওয়া মাত্র কেষ্টবাবু জানালা গ'লে দেওয়ালের থ'াম ব'য়ে নিচে নেমে গেলো। কিন্তু আমি এই সব ডাকাতদের কথামত কাজ করতে আদপেই ভরসা পেলাম না। আমি খোকাকে স্পষ্ট

জানিয়ে দিলাম যে তাদের সঙ্গে আমি কোথায়ও যাব না এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের লোকের সাহায্যের জন্ত চীৎকার করতে শুরু করে দিলাম— 'ওগো কে কোথায় আছ আমাকে রক্ষা করো। খোকাবাবু এসে আমাকে খুন করে ফেললো গো। শীঘ্র তোমরা থানায় খবর দাও গো' ইত্যাদি কথা বলে। আমাকে এই ভাবে চেঁচিয়ে উঠতে দেখে খোকাবাবুও 'ধ্যেৎ' ব'লে কেষ্টর মত খ'ড়া ব'য়ে নিচে নেমে গেলেন। তার কিছুক্ষণ পরেই আমি শুনতে পেলাম বাইরে বন্দুক ছোঁড়ার দড়াদম আওয়াজ হচ্ছে। এই জন্য তখন থেকে ভয়ে ঘরের মধ্যেই আমি বসেছিলাম।"

আমরা অকুস্থল হতে দড়ি, কাপড়, ক্লোরোফর্মের শিশি প্রভৃতি প্রদর্শনী দ্রব্য কয়টি সাবধানে সংগ্রহ করে নিজেদের হেপাজতিতে গ্রহণ করলাম। ঐ ঔষধের শিশিটা গ্রহণের সময় আমরা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেছিলাম, কারণ তাতে খোকাবাবুর অঙ্গুলির টিপ-চিহ্ন সন্নিবেশিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ'ছাড়া নেমে এসে আমরা পাশের গলিতে এবং বাটীর দেওয়ালের গাত্রে অপরাধীদের পদচিহ্নের সন্ধানও করেছিলাম। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা বিশেষ সফলতা লাভ করতে পারিনি।

সাক্ষিনী মলিনা সুন্দরীর উপরোক্ত বিবৃতিতে আমরা কেষ্ট এবং সুবল নামে আরও দুই ব্যক্তির নাম জানতে পারি। খোকাবাবুর দলে যে বহু ব্যক্তি সংযুক্ত আছে তা ইতিপূর্বেই আমরা অনুমান করতে পেরেছিলাম। এইজন্য মলিনা সুন্দরীকে এই সম্পর্কে জেরা করে এদের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। এ'ছাড়া আরও একটি বিশেষ তথ্য তার কাছ হতে অবগত হওয়া আমাদের দরকার হয়েছিল। এই তথ্যটি হচ্ছে এই যে, মলিনা সুন্দরী খোকার সহিত বহুদিন রক্ষিতা-রূপে বাস করা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে তার সঙ্গে অন্যত্র যেতে চাইছিল

না কেন? এই সকল দুরূহ মামলার তদন্তে পুলিশের কর্তব্য শুধু সাক্ষ্য সংগ্রহ করা নয়। মামলার শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত এই সাক্ষীকে নিজেদের তাঁবে রাখাও তাদের অপর আর এক বিশেষ কর্তব্য রূপে বর্তিয়ে থাকে। এইজন্য সাক্ষীদের মধ্যে কোনও বিসদৃশ ব্যবহার পরিলক্ষ্য করা মাত্র আমাদের কর্তব্য হচ্ছে উহাদের এইরূপ ব্যবহারের মনস্তাত্ত্বিক কারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এইজন্য এই সম্পর্কে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা মলিনা সুন্দরীর নিকট হতে আমরা অবগত হতে থাকি। নিম্নোল্লিখিত প্রশ্নোত্তর হতে বক্তব্য বিষয়টি বিশেষরূপে উপলব্ধি করা যাবে।

প্রঃ—আচ্ছা! তুমি তো কিছুকাল খোকাবাবুর রক্ষিতারূপে বাস করেছ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি খোকার সঙ্গে অন্যত্র যেতে রাজি হলে না কেন? খুব বেঁচে গেছ কিন্তু তুমি। হয়তো তোমাকেই এই দিন সে খুন করে বসতো।

উঃ—আজ্ঞে, যেভাবে আমরা জীবনযাপন করি তাতে যে কোনও দিন আমরা খুন হয়ে যেতে পারি। বাড়িতে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে অনেক কম। এইজন্য সাধারণত এমনি চেনা লোকের সঙ্গেও তাদের কথা মত অন্যত্র কোথাও আমরা যাই না। এক্ষণে এই হত্যা-কাণ্ডের পর ঐ ভয়ঙ্কর লোকটার সঙ্গে অন্যত্র কোথাও যাওয়া আমি নিরাপদ মনে করিনি। এ'ছাড়া নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে অন্য একজনের হেপাজতে আমি যাবোই বা কেন? আমাদের এই জঘন্য জীবনের একমাত্র সুবিধা হচ্ছে এই স্বাধীনতা। স্বেচ্ছায় এই স্বাধীনতা হারাতে আমরা সাধারণত রাজি হই না। অন্যান্য কারণের মধ্যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার এইটিই ছিল অন্যতম কারণ। খোকাবাবু এই বিশেষ সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি আমার সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করে আমাকে জোর করে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।

প্রাঃ—হাঁ। আমরাও এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে একমত। কিন্তু একটি কথা আজ আমাদের কাছে তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। তুমি উপরোক্ত কারণ ছাড়া খোকাবাবুকে প্রত্যাখ্যানের অন্যান্য কারণের কথাও বলেছ। আমরা কি ধরে নিতে পারি যে এই অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ ছিল খোকাবাবুর প্রতি তোমার সাম্প্রতিক ক্রোধ। খোকাবাবু পাগলাকে অকারণে হত্যা করার জন্য তার উপর তোমার এক দারুণ বিতৃষ্ণা এসেছিল। আসলে তুমি পাগলা-বাবুকেও খোকাবাবুর মতই প্রীতির চক্ষে দেখতে।

উঃ—কেন আপনারা এইসব অবান্তর কথা জিজ্ঞাসা করে আমাকে মিছামিছি কষ্ট দিচ্ছেন। খোকাবাবু আমাকে প্রচুর অর্থ প্রতি মাসে দিয়ে এসেছেন। তাঁর মত দুর্দান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অন্যত্র গেলে আমাকে তাঁর একান্তরূপে তাঁবে থাকতে হতো। আমার প্রাপ্য অর্থের কথা তুললে হয়তো তিনি আমাকে একাকী পেয়ে অকথ্য নির্যাতন করতেন। খুনে ডাকাত প্রভৃতিদের ভালবাসার কোনও স্থিরতা আছে ব'লে আমরা কেউই বিশ্বাস করি না। কিন্তু পাগলাবাবুর কাছে আমি কোনও দিনই একটি কপর্দকও নিই নি। বরং সে আমাকে গানবাজনা শেখাতো ব'লে প্রথম প্রথম আমিই তাকে বহু অর্থ পারিশ্রমিকরূপে দিয়ে এসেছি। তবে এদানী রাত্রে সে অতিরিক্ত মদ্যপান শুরু করে-ছিল। এই দুর্বিপাক হতে তাকে রক্ষা করার জন্যই আমি কিছুদিন তাকে অধিক অর্থ প্রদানে বিরত ছিলাম। তবে ভালবাসা শব্দটি আমাদের কাছে।আপনারা আর দয়া করে তুলবেন না। আমরা মানুষকে খুশি করতে শিখেছি, কিন্তু তাদের আমরা ভালবাসতে শিখিনি। তবে—থাক সে সব কথা। আজ্ঞে হাঁ, একথা সত্য, পাগলাবাবু নিহত হওয়ায় আমরা সকলেই খুব ব্যথা পেয়েছি, বাবু। প্রকৃতপক্ষে এখনও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যে তার মত নিরীহ

মানুষকে নিহত করতে পারে এমন নিষ্ঠুর মানুষও পৃথিবীতে বিচরণ করছিল।

প্রঃ—আচ্ছা, এইবার বলো এই কেষ্টবাবু এবং সুবলবাবু লোক দুইটি কারা? খোকাবাবু যে একটা খুনের দলের সর্দার এখন তুমি তা তো ভাল করেই বুঝেছ। এইবার তা'হলে তুমি মনে করে করে বল, তার দলে আর কোন্ কোন্ ব্যক্তি তোমার ধারণা মত সংযুক্ত ছিল?

উঃ—আজ্ঞে, আমি এই কেষ্টবাবু, সুবলবাবু, কালীবাবু এবং গোপীবাবু নামে কয়টি লোককে খোকাবাবুর বন্ধুরূপে চিনি। এরা সকলে মধ্যে মধ্যে খোকাবাবুর সঙ্গে আমার ঘরে এসে আমার গান শুনে গিয়েছে। কিন্তু এরা আমার সঙ্গে কোনও প্রকার বেল্লীকী ব্যবহার করতে কোনও দিনই সাহসী হয় নি। তবে আমি এ'ও লক্ষ্য করেছি যে, এরা খোকাবাবুকে সব সময়েই ভয় ও সেই সঙ্গে ভক্তি করে চলত এবং এদের উপর খোকাবাবুর প্রভাপ ও সেই সঙ্গে বিশ্বাসও ছিল অসীম।

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তর হতে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই প্রধানা সাক্ষিনী মলিনা সুন্দরীর সহিত খোকাবাবুর আর স্যাক্ষাৎকার না ঘটলে তাকে বিচারের শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের তাঁবে রাখা খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। তবে মলিনা সুন্দরীর হাবভাব হতে আমরা এ'কথাও বুঝেছিলাম যে তাকে রক্ষা করার অজুহাতে তাকে নজর বন্দিনী করে রাখারও প্রয়োজন আছে। মধ্যে মধ্যে তাকে পাগলাবাবুর নিহত হওয়ার করুণ কাহিনী শুনিয়ে তাকে খোকাবাবুর প্রতি বিরূপ করে রাখা আমাদের উচিত হবে।

পরের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ প্রত্যুষে ছয়টার সময় আমরা সকলেই যথারীতি অফিস ঘরে নেমে এলাম। গত দিবস অধিকরাত্র পর্যন্ত কার্যে রত থাকায় আমাদের কাহারও ভালো করে ঘুম হয় নি।

এতদিনে আমরা ভালরূপেই বুঝতে পেরেছি যে এই খুনের কিনারা করতে হলে আমাদের মৃত্যুপণ করে এগিয়ে যেতে হবে। এমন কি আমাদের মধ্যে যে কেহ যে কোনও মুহূর্তে নিহতও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জার্মান আর্মি এবং ব্রিটিশ নেভির ন্যায় কলিকাতা পুলিশেরও একটা ঐতিহ্য ছিল। এই বিশেষ ঐতিহ্য গুরু পরম্পরায় আমরা অর্জন করেছিলাম। এতদিনের এত বড় ঐতিহ্য আমাদের পক্ষে হেলায় হারিয়ে ফেলাও সম্ভব নয়। আমরা যে কোনও দুর্বিপাক মাথা পেতে নেবার জন্য প্রস্তুত হলাম। এখন আমাদের একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হলো পরবর্তী তদন্ত এখন কোন দিকে পরিচালিত করা উচিত হবে তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা।

আমরা ইতিমধ্যেই জেনে নিয়েছি যে, এই হত্যাকাণ্ডটি খোকাবাবু এবং তার দলের লোকদের দ্বারা সমাধা হয়েছে। কিন্তু এই খোকাবাবুটির প্রকৃত পরিচয় কি? তিনি কে এবং থাকেনই বা তিনি কোথায়? অভিজ্ঞ ইনস্পেক্টার সুনীলবাবু মত প্রকাশ করলেন যে, এখনো পর্যন্ত এইরূপ এক দুর্দান্ত ব্যক্তি কোনও না কোনও সূত্রে কলিকাতা পুলিশের নজরে আসেনি তা কখনও হতে পারে না। আমাদের পরামর্শ সভায় তিনি দৃঢ় চিত্তে ঘোষণা করলেন যে নিশ্চয় লোকটা কলিকাতা পুলিশের নিকট অন্য কোনও নামে পরিচিত আছে।

এই সময় সহসা আমার স্মৃতি পথে উদয় হলো প্রায় বৎসরাধিক পূর্বেকার একটি ঘটনা। এই ঘটনাটি "শিউচরণ হত্যাকাণ্ড" নামে ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। এই শিউচরণ ওরফে শিউচরণিয়া ছিল একজন পুরাতন পাপী। তবে শেষের দিকে আর চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত না থেকে সে চোরদের ধরাতে এবং চোরাই মাল উদ্ধার করতে আমাকে প্রায়ই সাহায্য করত। এজন্য আমি তাকে প্রতিটি মামলা

বাবদ প্রচুর অর্থও প্রদান করেছি। একদিন সে আমাকে জানাল যে, খাঁদা নামক একজন জিলাখারিজ গুণ্ডা গুণ্ডা-আইন অমান্য করে কলিকাতায় ফিরে এসেছে। এই খাঁদা গুণ্ডার নাম পূর্ব থেকেই আমাদের জানা ছিল। দুই বৎসর পূর্বে দেওয়াদত তেয়ারী নামক জনৈক জমাদার তাকে ধরতে গেলে সে তাকে ছুরি মেরে পালাবার চেষ্টা করে। এই মামলাটি আমিই তদন্ত করেছিলাম। আমার রিপোর্ট অনুযায়ী পুলিশের ঐ জমাদারটি বীরত্বের জন্য ভারতীয় পুলিশ পদকও প্রাপ্ত হয়েছিল। আমার অনুরোধে আমার ঐ ইনফরমার শিউচরণ খাঁদা গুণ্ডার কৃপানাথ লেনের বাড়িটা দূর হতে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়ছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় খাঁদা গুণ্ডা তার বাড়ি থেকে বার হয়ে আমাদের উভয়কে সেখানে একত্রে দেখে ফেললে। আমি তৎক্ষণাৎ পথের উপর দিয়ে দৌড়ে তাকে ধরতেও গিয়েছিলাম। কিন্তু খাঁদা গুণ্ডার সঙ্গে একটি সাইকেল থাকায় সে তাতে চড়ে সহজেই অদৃশ্য হয়ে যেতে পেরেছিল। এর পর দিনই রাত্রে আমরা খবর পেলাম যে শিউচরণ ওরফে শিউচরণিয়াকে কে বা কাহারা হত্যা করে কুমারটুলির রাস্তার একটি রোয়াকের উপর ফেলে রেখে গিয়েছে। আমরা তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসে দেখি শিউচরণের মৃতদেহ রক্তাপ্লুত অবস্থায় একটি গৃহের রোয়াকে পড়ে রয়েছে। অকুস্থলে বহু লোককেই এই হত্যা সম্বন্ধে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলাম, কিন্তু তারা কেহই ঐ নৃশংস হত্যা সম্বন্ধে কোনও খবর আমাদের দিতে পারেনি। মৃত পাগলাবাবুর দেহের ন্যায় শিউচরণিয়ার দেহেও আমি একই প্রকারের ক্ষত পরিলক্ষ্য করেছিলাম। এই উভয় ব্যক্তিকে একইভাবে বক্ষে ছুরিকা দ্বারা আঘাত করে হত্যা করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, তখনও পর্যন্ত আমরা এই খুনের কোনও কিনারা করতে সমর্থ হইনি। সম্ভবত অনুরূপভাবে নিহত হবার ভয়ে ঐখানকার বস্তী অঞ্চলের কেহ খাঁদা গুণ্ডার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে রাজি

হয়নি। এ মামলাটি ব্যতীত অপর আর একটি মামলারও আসামীরূপে তাকে আমি খোঁজাখুঁজি করেছিলাম। এই মামলাটি ছিল একটি সিঁদেল চুরির মামলা। কুমারটুলির এক নামকরা জমিদার বাড়ি হতে একটি টোটা ভরা রিভলভার সহ সহস্র সহস্র মুদ্রার জুয়েলারি দ্রব্য চুরি হওয়ায় এই মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে গঙ্গা-বক্ষে নৌকা করে পার হবার সময় হাওড়ার জনৈক পুলিশ অফিসার তাকে ঐ নৌকাতে গ্রেপ্তারও করেছিল। কিন্তু খাঁদা গুণ্ডা তাকে অতর্কিতে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করে নিজে সাঁতার কেটে ওপারে উঠে পালিয়ে গিয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে খাঁদা গুণ্ডা ছিল এহরূপ এক সাংঘাতিক ব্যক্তি। এইবার আমার আর কোনও সন্দেহ রইলো না যে, এই খোকা ও খাঁদা একই ব্যক্তি, তারা দুজনে কখনই বিভিন্ন ব্যক্তি হতে পারে না।

এরপর আমরা আর দেরি না করে লালবাজারের পুলিশ হেডকোআর্টারস্ থেকে একদল সশস্ত্র বাহিনী আনিয়ে নিলাম। তারপর দুইখানি লরিতে দুইদিক থেকে অভিযান চালিয়ে অতর্কিতে ঐ বাড়িটি আমরা ঘেরোয়া করে ফেলে উহার মধ্যে আমরা ত্বরিত গতিতে ঢুকে পড়লাম। এই বাড়িটি ১০ নম্বর কৃপানাথ লেনের একটি বস্তীর সম্মুখভাগে অবস্থিত ছিল। স্থানীয় লোকদের কেউ কেউ চুপি চুপি আমাদের জানিয়ে দিল যে ঐ বস্তীর কোণের ঘরখানিতে ঐ খাঁদা গুণ্ডা নিজে থাকতো এবং তার পাশের ঘরখানিতে এখনও তার আত্মীয় স্বজনেরা বসবাস করছে। এই মামলার হত্যাকারী আসামী খোকা বা খাঁদাকে সেখানে পাওয়া গেল না। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হলো যে হয়তো ঐ ঘরের মাটির মেঝেয় পাগলার কাটা মুণ্ডটা পুঁতে রাখা হয়েছে। আমরা তৎক্ষণাৎ সাবল ও কোদাল এনে ঐখানকার মৃত্তিকা অপসারিত করতে শুরু করলাম। অবশ্য সেখানে বহু খোঁজা-খুঁজি করেও কাটা-মুণ্ডের সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তার পরি-

বতে´ মাটির তলা হতে বার হয়ে আসতে লাগল রাশি রাশি হীরা-মুক্তা ও জহরতের অলঙ্কার এবং বাক্সবন্দী হাজার ও একশত টাকার কারেন্সি নোট। এইদিন ঐ স্থান হতে অলঙ্কারে ও নগদ টাকায় প্রায় ৩০ হাজার টাকার অপহৃত সম্পত্তি আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলাম। শুধু তাই নয়, ঐ ঘরের একটি কোণ হ'তে একটি রক্তরঞ্জিত ধুতি, একটি রক্তরঞ্জিত অন্তর্বাস, দুইটি রক্তরঞ্জিত পাঞ্জাবী এবং অন্যান্য কয়েকটি কাপড়-চোপড় উদ্ধার করতে সক্ষম হলাম। এইগুলি ঘরের ঐ কোণে একত্রে জড় করে রাখা হয়েছিল। ঐ সকল পরিধেয় বস্ত্রাদি পরীক্ষা করে আমরা দেখতে পেলাম যে উহার প্রতিটি কোণে একটি ইংরাজী 'S' অক্ষর সুতির দ্বারা উৎকীর্ণ করা রয়েছে। এই বাড়ির অপরাপর ঘরে যারা বাস করে তারা সকলেই ছিল গৃহস্থবেশী বেশ্যা নারী। এরা সাধারণত দিনের বেলা ঝি-গিরি করে এবং রাত্রে তারা করে পেশা। এদের মধ্যে দুই-একজন আবার সাধারণ বেশ্যানারীর পর্যায়ে নেমে এসেছিল।

আমি এদের সকলকেই একে একে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম যে খোকাবাবুর পিতা ও খুল্লতাত নামে পরিচিত দুই ব্যক্তি সাধারণত খোকাবাবুর ভাড়া করা এই ঘর দুইটিতে বসবাস করে। এরা খোকাবাবুর আসল বা নকল আত্মীয় কি না তা তারা বলতে পারে না। তবে তাদের মতে এরা খোকাবাবুর নকল বা পাতানো আত্মীয় মাত্র। প্রথমে এরা খুন সম্পর্কে কোনও বিবৃতি দিতে চায় নি। খোকাবাবু সম্বন্ধে তাদের জিজ্ঞাসা করা মাত্র তারা আতঙ্কে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আমাদের পীড়াপীড়িতে এদের কেউ কেউ ভয়ে কেঁদেও ফেললে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ইনসপেক্টার সুনীল রায়ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে এই সকল রূপ-জীবিনীদের নিকট হ'তে বিবৃতি আদায়ের কাজে ব্যর্থ মনোরথ হতে

দেখে তিনি আমাকে বললেন; এরা এখন যা বলে তা শুনে যাও মাত্র। প্রথম দিনে এরা কোনও সত্য কথা বলে না। আজ হ'তে তিন-চার দিন পর সত্য কথা বলবে। সাধারণত বেশ্যা নারীদের সত্য ভাষণের নিয়মই হচ্ছে এই। সুনীলবাবু এদের মধ্যে থেকে বেছে বেছে একটি যুবতী নারী ও একটি তিলক পরা বৃদ্ধাকে বেছে দিয়ে আমাকে বললেন, 'এখন এদের পৃথক পৃথক ভাবে অর্থাৎ একের আড়ালে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ কর। এদের এখন তুমি ঐ পাশের ঘরে নিয়ে যাও। ততক্ষণ আমি মেঝেটা আরও একটু খুঁড়ে দেখি।' বিভিন্ন বয়সের দুটি নারীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বেছে নেওয়ার কারণ সম্বন্ধে ইন্‌সপেকটার সুনীল বাবু বলেছিলেন যে, এতদ্বারা এরা সত্য বা মিথ্যা বলেছে তা সম্যকরূপে বুঝা যাবে। এর কারণ এই যে, বিভিন্ন বয়সের মানুষের বচন বিন্যাস বিভিন্নরূপের হয়ে থাকে। খোকাবাবুর ঘরের মেঝের তলা থেকে এত সোনা-দানা বেরিয়েছিল যে, একজন দায়িত্বপূর্ণ অফিসারের উপস্থিতি একান্তরূপে প্রয়োজন ছিল। তা না হলে স্বপক্ষীয় এবং বিপক্ষীয় ব্যক্তিদের দ্বারা লুটপাট হওয়াও অসম্ভব ছিল না। এইজন্য ইন্‌সপেকটার সুনীল রায়ের উপদেশ শিরোধার্য করে বেশ্যা নারী দুইটিকে পৃথক পৃথক ভাবে তাদের আপন আপন ঘরে নিয়ে তাদের বহু অভয় দিলাম এবং এই কথাও তাদের বললাম যে তারা যা বলবে তা কাউকেই জানানো হবে না। এইভাবে বহু সাধ্যসাধনার পর তারা স্বীকার করলো যে তারা খোকাবাবুকে একজন খুনে গুণ্ডা বলেই চেনে। তারা জানালো, "খোকাবাবু প্রায়ই আজকাল তাঁর এই বাড়িতে আসেন, কিন্তু রাত্রিবাস এখানে তিনি কদাচ করে থাকেন। এই দিন ৪'ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬ রাত্রি আন্দাজ ১২-৩০ মিঃ ঘটিকায় আমাদের কেউ কেউ দরজার গলির মুখে খদ্দেরের আশায় দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ খোকাবাবু বাড়ির ভিতর ঢুকতে ঢুকতে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই ভাগ। যা সব যে যার ঘরে।

যতক্ষণ আমি এখানে থাকব ততক্ষণ কেউ কক্ষনো বেরুবি না। খবরদার। দেখছিস্ তো এই ছুরি!' এই বলে হাতের আস্তিন থেকে একটা ছুরি বার করে তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। এই ভয়ে যে যার ঘরে চলে এসে আমরা দরজা বন্ধ করে দিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে কারুর সাড়া না পেয়ে আমরা মনে করেছিলাম খোকাবাবু চলে গিয়েছে। তাই আমরা কেউ কেউ সাহস করে বাইরে এসে দেখি, খোকাবাবুর বাবা চৌবাচ্চা থেকে বালতি করে জল তুলে কতকগুলো কাপড়-চোপড় কাচ্ছে। উঠানের উপর এই সময় জোছ্নার আলো এসে পড়েছিল। এই আলোতে আমরা দেখলাম যে বালতির জল টকটকে লাল। এইবার খোকাবাবু হঠাৎ তার ঘর হতে বার হয়ে এসে ধমকে উঠলো, 'তোরা যে বের হয়ে এসেছিস্? যা যা যে যার ঘরে।' আমরা খোকাবাবুকে যমের মতই ভয় করে থাকি। তাই 'যাচ্ছি যাচ্ছি' বলে আমরা আপন আপন ঘরে এসে ভয়ে অর্গল বন্ধ করে দিয়ে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়েছিলাম। এই কয়টি বিষয় ছাড়া এই খোকা বা খাঁদাবাবুর কার্যকরণ সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই বলতে পারবো না। তবে এ'কথা আমরা সকলেই জানি যে খাঁদাবাবুর ব্যবহৃত প্রতিটি পরিচ্ছদে ইংরাজি 's' অক্ষরটি তাঁরই ইচ্ছা মত লিখে রাখা হতো। আমরাও মধ্যে মধ্যে অনুরুদ্ধ হয়ে ঐ 's' অক্ষরটি তাঁর কাপড়-জামার কোণে কোণে সুতার সাহায্যে তুলে দিয়েছি। এই 's' অক্ষরটি খাঁদাবাবুর নিকট একটি বিশেষ শখের বস্তু ছিল।"

এই সময় আমরা খোঁজাখুঁজি করে খেঁদার পাতানো পিতার নিকট হতে ধোপার হিসাব সহ একটি নোটবুকও উদ্ধার করতে সমর্থ হই। ঐ নোট বুকের লেখা হতে প্রমাণিত হয় যে অনুরূপ আরও কয়েকটি কাপড়-চোপড় ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬ তারিখে ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ধোপাটির নাম ঠিকানাও ঐ নোটবুকে লিখে রাখা ছিল।

এর পর আমি অন্যান্য অফিসারদের খাঁদার পিতার বাটীতে তদন্ত-রত রেখে ঐ নোটবুকটি সহ মানিকতলা স্ট্রিটে তাদের ধোপা মাথুরামের ভাটিখানায় এসে উপস্থিত হলাম। সৌভাগ্যক্রমে তাদের সেই ধোপাটি সেইখানে উপস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত সে তখনও পর্যন্ত খাঁদার ঐ সকল কাপড়-চোপড় কাচাকাচি করতে আরম্ভ করেনি। আমরা ঐ নোটবুকের লেখানুযায়ী প্রতিটি বস্ত্র উদ্ধার করে দেখি যে তাদের প্রতিটিতেই এক-একটি 's' অক্ষর সুতার সাহায্যে তুলা হয়েছে তো বটেই, অধিকন্তু ঐ সকল বস্ত্র ও শার্টের স্থানে স্থানে তখনও পর্যন্ত শুষ্ক রক্তের প্রলেপ দেখা যায়। আমি তৎক্ষণাৎ দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর সমক্ষে ঐ সকল পরিধেয় পরিচ্ছদসমূহ উহাদের যথাযথ বিবরণ সহ তালিকাভুক্ত করে আপন হেপাজতে গ্রহণ করে নিই। এই সকল কাপড়ে রক্তের দাগ-গুলি মনুষ্য রক্ত বলে সরকারী রক্তপরীক্ষক অভিমত প্রকাশ করলে উহা যে আসামীদের বিরুদ্ধে এক অকাট্য প্রমাণ রূপে বিবেচিত হবে তাতে আমাদের কোনও সন্দেহ ছিল না। তবে কয়েকটি রক্তমাখা কাপড়-চোপড় ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে কয়েকটি রক্তমাখা কাপড়-চোপড় মজুত রাখার অর্থ আমরা বুঝতে পারলাম না। তা সত্ত্বেও আমি উৎফুল্ল হয়ে খেঁদার পিতার বাটীতে ফিরে এসে দেখি ইন্‌সপেকটার রায় বহুলোককে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ঐ পল্লী হতে দেবেনবাবু নামে একটি নির্ভর-যোগ্য সাক্ষীকে খুঁজে বার করেছেন। আমি তাঁকে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসা-বাদ করার পর সোল্লাসে তাঁর বিবৃতিটুকু লিপিবদ্ধ করতে শুরু করে দিই। তাঁর মহামূল্যবান বিবৃতির উল্লেখযোগ্য অংশটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

"১৯৩৬ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি ১২-৩০ মিনিটে ১০ কৃপানাথ লেনে খাঁদাবাবুর বাটীতে রোয়াকে বসে আমি বায়ু সেবন করছিলাম। এমন সময় আমি খেঁদাকে নগ্ন পদে একটি সাদা ধুতি ও একটি নীল রঙের শার্ট পরা অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হতে দেখি। খাঁদাবাবুর পিছন

পিছন তার বন্ধু কেষ্টবাবুকেও আমি আসতে দেখেছিলাম। আমার বেশ মনে পড়ে যে আমি খেঁদার ধুতি ও শার্টের উপর রক্তের দাগ দেখে চমকে উঠেছিলাম। আমার ভীত হয়ে উঠার অপর কারণ হচ্ছে এই যে, এই সময় খাঁদা একটি উন্মুক্ত ছুরিকার ব্লেড শার্টের হাতলের মধ্যে সেঁদিয়ে দিয়ে তার সাদা বাঁটের হ্যাণ্ডেলটি মুঠি করে ধবে রেখেছিল। খাঁদা কোনও দিকে দৃকপাত না করে ত্বরিত গতিতে তার পিতার ঐ বাটীটির মধ্যে প্রবেশ করলো। কিন্তু কেষ্টবাবু খাঁদাকে অনুসরণ না করে আমাকে বোধ হয় আগলাবার জন্যই সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি ভয়ে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে উত্থান শক্তি পর্যন্ত আমার রহিত হযে গিয়েছিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে খেঁদাবাবু তার বাটী হতে বার হয়ে এলো। তাকে দেখে মনে হলো যে সে ভালো কয়ে চান করেছে। এই সময় নীল শার্টের পরিবর্তে সে একটি ক্রীম্ রঙের শার্ট পরে গিয়েছিল। এছাড়া সে সারা দেহে প্রচুর সুগন্ধি সেণ্টও মেখে নিয়েছে। আমাকে তখনও পর্যন্ত সেখানে বসে থাকতে দেখে খেঁদা পকেট থেকে একটা রিভলভার বার করে তা আমাকে দেখিয়ে ইশারায় আমাকে চুপ করে থাকতে উপদেশ দিল। তারপর সে নির্বিঘ্নে শিষ দিতে দিতে কেষ্টব সঙ্গে পুনরায় শোভাবাজার স্ট্রিটের দিকে চলে গেল।"

এই সাক্ষী দেবেনবাবুর বিবৃতি যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল তাতে আমরা সকলেই একমত হয়েছিলাম। কিন্তু এক্ষণে এই দেবেনবাবুর সহিত খোকাবাবুব পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে কিছুটা তদন্ত করারও আমরা প্রয়োজন মনে করলাম। এই সম্পর্কে দেবেনবাবুকে আমরা বিশেষ রূপে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিলাম। নিম্নে উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর সমূহ এই সম্পর্কে বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

প্রঃ—আপনার সহিত খাঁদাবাবুর পরিচয় কতদিনের? আশা করি

আপনি ওদের একজন দলের লোক নন। এইরূপ একটি দৃশ্য দেখার পরও আপনি থানায় খবর দেননি কেন? ঐদিনকার খুনের সংবাদটি নিশ্চয়ই আপনার অগোচর ছিল না।

উঃ—আজ্ঞে, সে আমার বাল্যবন্ধু। আমি, খোকা, কেষ্ট ও হরিপদ এককালে স্থানীয় ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পড়াশুনা করতাম। তবে নিচের ক্লাশ হতেই আমরা একে একে ঐ স্কুল ত্যাগ করে আসি। আমাদের মধ্যে আমি এবং হরিপদ এই পাড়াতেই বাস করি। আমরা ব্যবসা বাণিজ্য করে স্ব স্ব জীবিকা অর্জন করে থাকি। আমাদের পূর্বতন বন্ধু খোকা ও কেষ্টর কথা আর জিজ্ঞেস করে লাভ কি? আজকাল আমরা ওদের সঙ্গ বিশেষরূপে এড়িয়ে চলে থাকি। পাড়ার আর পাঁচজনের মত আমরা ওদের ভয় করেও চলি। এই কারণেই আমরা কেহই ওদের সম্বন্ধে কোনও সংবাদ থানায় পৌছিয়ে দিতে সাহসী হইনি। ঐ দিনকার খুনটা যে খোকা-বাবুরাই করেছিল তা সহজেই আমরা অনুমান করে নিতে পেরে-ছিলাম। আজ্ঞে! এই সম্বন্ধে কোনও খবর আপনাদের দিলে ঐ নিহত ব্যক্তির ন্যায় আমরাও একে একে মুণ্ডচ্যুত হয়ে যেতাম। এই জন্যই সব বুঝে বা জেনেও আমরা চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলাম।

এক্ষণে এই দেবেন, মলিনা এবং অম্বিকার বিবৃতি তিনটি তাদের প্রদত্ত বিবিধ সময়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করে আমরা নিশ্চিত রূপে বুঝতে পারলাম যে, ঐ দিন সন্ধ্যা আট বা সাড়ে আট ঘটিকায় খোকা ওরফে খাঁদা তার সাকরেদের সাহায্যে পাগল ওরফে প্রতুলকে পাকড়াও করে ঐ মেথর গলিতে নিয়ে এসে সন্ধ্যা নয় ঘটিকা আন্দাজ সময়ে তাকে ছুরিকাহত করে ফেলে রেখে যায়। এরপর নিকটের কোনও একস্থানে তাদের রক্তরঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিবর্তন করে তারা

রূপজীবিনী উষারাণীর গৃহে এসে মলিনা সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করে। তবে ঐ রাত্রে উষার কক্ষে তারা অধিকক্ষণ সময় অতিবাহিত করেনি। স্বল্পক্ষণ পরে তারা পুনরায় বহির্গত হয়ে ঐ মেথর গলিতে ফিরে এসে পাগলার মুণ্ডটা কেটে নিয়েছে। এরপর তারা ঐ মুণ্ডটা নিকটে কোনও এক স্থানে নিক্ষেপ করে খোকা ও কেষ্ট, খোকার কৃপানাথ লেনের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। সম্ভবত খোকা পাগলার দেহ হতে তার মুণ্ড-কর্তন কার্যে একাই লিপ্ত হয়েছিল। এইজন্য মাত্র তারই পরিচ্ছদ এই সময় রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠে। এইজন্য একমাত্র তারই পুনরায় পরিচ্ছদ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল। যতদূর বুঝা যায় তাতে খোঁদার ঐ রাত্রে দুইবার রক্তরঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল; প্রথমবার যখন সে পাগলাকে ছুরিকাহত করে এবং দ্বিতীয়বার যখন তাকে তাব মুণ্ডকর্তন কার্যে লিপ্ত হতে হয়। প্রকৃত পক্ষে মলিনা ও দেবেন—এই উভয় সাক্ষীই খোকাকে ঐ রাত্রে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দুইবার পোশাক পরিবর্তন করে আসতে দেখেছিল। প্রথমবার তারা খোকাকে নীল এবং দ্বিতীয়বাব তাকে ক্রীম রঙের শার্ট পরে বেরুতে দেখেছে।

খুন সম্বন্ধে উপরের থিওরিটি আপাত দৃষ্টিতে সত্য ব'লে মনে হলেও উহাতে সন্দেহ করারও যথেষ্ট কারণ ছিল। সাক্ষী মলিনা সুন্দরীর বিবৃতি হতে আমরা জেনেছি যে, সে উষার কক্ষে খোকার নীল শার্টের উপর লাল রঙের দাগ দেখেছিল। কিন্তু দুইটি বিশেষ কারণে ঐ রাত্রে মলিনা খোকার শার্টের উপর সত্যই রক্তের দাগ দেখেছিল কিনা তাতে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ হয়েছিল। প্রথমত ঐ নীল শার্টটি পরে খোকা পাগলাকে ছুরিকাহত করলে তার ঐ শার্টের অনেক-খানি স্থান রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠতো। এর কারণ এই যে, ছুরিকা দেহে প্রবেশ করলে সেখান হতে ফিনকি দিয়ে রক্ত বহির্গত হওয়াই স্বাভাবিক

ছিল। অবশ্য যদি অন্যমনস্কতা বশত খোকার পোশাক পরিবর্তনের সময় তার ঐ নূতন নীল শার্টের সহিত তার রক্তরঞ্জিত পরিত্যক্ত শার্টের সংযোগ হয়ে থাকে তা'হলে সেকথা স্বতন্ত্র। কিন্তু পরে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে নীল কাপড়ের উপর মনুষ্যরক্ত পড়লে উহা রাত্রিকালে কালো দেখায়। ঐ অবস্থায় মনুষ্যরক্ত বিন্দু কখনও লোহিত বর্ণের রূপে প্রতীত হয়নি। অন্যদিকে পানের পিচ কোনও এক নীল বস্ত্রখণ্ডের উপর নিক্ষিপ্ত হলে উহা রাত্রিকালে টকটকে লাল-বর্ণের দেখা যাবে। এইজন্য আমাদের মনে হল যে খেঁদা যখন মলিনার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, যে, উহা রক্ত নয়—পানের পিচ, তখন সে সত্য কথাই বলেছিল। এইরূপে খুন সম্পর্কে আমাদের পরিকল্পিত থিওরিটিকে আমরা সহজেই পুনঃ সংস্থাপিত করতে পেরেছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও অপর একটি বিশেষ বিষয়ের সন্দেহের নিরসন করতে আমরা সক্ষম হচ্ছিলাম না। কৃপানাথ লেনে খোকাবাবুর কক্ষ থেকে আমরা একাধিক প্রস্থ রক্তরঞ্জিত কাপড়-চোপড় উদ্ধার করতে পেরে-ছিলাম। এখন আমাদের আদালতকে বুঝাতে হবে যে এতোগুলি রক্তমাখা কাপড়-চোপড় ঐ স্থানে কেনই বা পাওয়া গিয়েছিল। কৃপানাথ লেনের সকল সাক্ষীই এক বাক্যে স্বীকার করেছিল যে তারা খোকাকে ঐ স্থানে ঐ রাত্রে একবারই আসতে দেখেছে। তাহলে কি পাগলার দেহ হতে তার মুণ্ডটি বিচ্যুত করার পর পরিচ্ছদ পরিবর্তনের জন্য সে ঐ স্থানে পুনরায় ফিরে এসেছিল? তবে এমনও হতে পারে যে পাগলাকে ছুরিকাহত করার পর ঐ বাটীর পিছনের দরজা দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে কেষ্ট ও খোকা তাদের কক্ষে এসে রক্তরঞ্জিত কাপড়-চোপড় একবারই পরিবর্তন করেছিল। এই সময় ধোপার বাড়িতে পাঠানোর জন্য ঘরের কোণে জড় করে রাখা ময়লা কয়েকটি কাপড়-চোপড়ের উপর তারা তাদের পরিত্যক্ত রক্তমাখা কাপড়-চোপড় ছেড়ে রেখে থাকবে। এইজন্য

ঐ সকল জামা কাপড়ও কিছু কিছু মনুষ্য রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। এইজন্য খাঁদার ঐ কক্ষে আমরা তার কয়েক প্রস্থ জামা ও কাপড় মনুষ্য রক্তে রঞ্জিত দেখেছিলাম। এই সকল সমস্যা ব্যতীত আরও একটি নূতন সমস্যার কথা আমাদের মনে উদিত হয়েছিল। সাক্ষী দেবেনের বিবৃতি হতে আমরা জেনেছিলাম যে, সে খোকাকে রক্তমাখা শার্ট পরে ঐ রাত্রে তাদের কৃপানাথ লেনের বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখেছিল। আমরা বুঝেছিলাম যে, খোকাবাবু পাগলার মুণ্ড-কর্তনের পর ঐ ভাবে কেষ্টর সহিত কৃপানাথ লেনের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। কিন্তু মৃত ব্যক্তির দেহ হতে মুণ্ড কেটে নিলে ফিনকি দিয়ে রক্ত নির্গত হবার কথা নহে। ইহাই যদি সত্য হয় তা'হলে এই সময় খোকাবাবুর ঐ শার্টের বহু স্থানে রক্তের ছোপ সমূহ লাগে কি করে? কিন্তু এই দুরূহ সমস্যার সমাধান আমরা পাগলার শব-ব্যবচ্ছেদকারী পুলিশ সার্জেনের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে উল্লিখিত তথ্যের সাহায্যে করে ফেলেছিলাম। ঐ রিপোর্টে শব ব্যবচ্ছেদক ডাক্তার সাহেব সুস্পষ্টরূপেই জানিয়েছিলেন যে, ছুরিকাহত হওয়ার পরও পাগলার জীবনের অবসান হয়নি। সে এই সময় মৃতপ্রায় হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় ঐ স্থানে পড়েছিল। পরে খুনীগণ ঘটনাস্থলে ফিরে এসে পাগলার জীবিত অবস্থাতেই তার দেহ হতে তার মুণ্ডটি কেটে নিয়েছিল। এইভাবে ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সংগৃহীত তথ্য সমূহের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা আমাদের উপরোক্ত থিওরিটি যে নিঃসন্দেহরূপে সত্য তা সম্যকরূপেই প্রমাণিত করতে পেরেছিলাম।

এইবার আমরা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝতে পারলাম যে, খাঁদা ওরফে খোকাই ছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক এবং এই ব্যাপারে তার অন্যতম সহকারী ছিল দলের অপর নেতৃদ্বয়—গোপী ও কেষ্টবাবু। কিন্তু এই অপকার্যের জন্য তাকে কতগুলি লোক সাহায্য করেছিল তা তখনও

পর্যন্ত বুঝা গেল না। যাই হোক এক্ষণে আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো এই পলাতক খোকা ওরফে খাঁদাকে এবং তার প্রধান সাকরেদদ্বয় গোপী ও কেষ্টকে খুঁজে বার করে গ্রেপ্তার করা। এই উদ্দেশ্যে আমরা দিকে দিকে গোপন তদন্তের জন্য গুপ্তচর এবং প্রকাশ্য তদন্তের জন্য কয়েকজন গোয়েন্দা অফিসারকে নিযুক্ত করে—এই মামলা সম্পর্কে বিবিধ স্থান হতে সংগৃহীত দ্রব্যাদিসহ বিশ্রামের জন্য থানায় ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু পরিপূর্ণ বিশ্রামের জন্য পর্যাপ্ত সময় আমাদের তখন কোথায়? কিছুক্ষণ পর পুনরায় আমরা অফিস ঘরে সমবেত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করে দিলাম।

বড় বড় মামলার তদন্ত কার্যে মধ্যে মধ্যে তদন্ত দ্বারা সংগৃহীত তথ্যসমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এই সময় রক্ষীকুলকে একদিকে যেমন ভেবে দেখতে হয় যে এই হত্যা-কার্যে অপরাধীরা এই এই কার্য কেন করেছিল, তেমনি তাঁদের এ'ও ভেবে দেখতে হয় যে এই এই কার্য তারা করতে পারতো, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা তারা কেন করেনি? এইভাবে বিষয়বস্তুর সম্যক আলোচনার পর রক্ষীকুলকে তদন্ত কার্যের জন্য তাদের পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারিত করতে হয়েছে। এইজন্য থানায় ফিরে কিছুক্ষণের জন্য এই দুরূহ তদন্ত কার্যে ক্ষান্ত দিয়ে আমরা একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হলাম। এই সভায় তদন্ত দ্বারা সংগৃহীত তথ্য সকল সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে চিন্তা করে আমরা নিম্নলিখিত রূপ এক সুচিন্তিত অভিমতে উপনীত হই।

খোকাবাবু, গোপীবাবু, কেষ্টবাবু, সুবল, কালী প্রভৃতি কয়েক-জন খোকাবাবুর নেতৃত্বে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রি ৮-৩০ এর সময় সোনা-গাছি হতে পাগলকে পাকড়াও করে কুমারটুলির ঐ মেথর গলিতে এনে রাত্রি নয়টা আন্দাজ সময় তাকে ছুরিকাহত করে সেখানে

ফেলে রাখে। এরপর গোপীবাবু খুব সম্ভবত খোকার অনুমতি পেয়ে নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। গোপী চলে গেলে খোকা তার সাকরেদ আসামী কালী ও সুবল প্রভৃতিকে তার রক্ষিতা মলিনাকে তার ডেরা থেকে তুলে নিয়ে তাকে উষার বাড়িতে রেখে আসবার জন্য আদেশ করে। কালী, সুবল প্রভৃতি ঘটনাস্থল ত্যাগ করলে খোকাবাবু কেষ্টকে নিয়ে তাদের কৃপানাথ লেনের বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে সেই বাড়িতে সবার অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছিল। ঐ বাড়ির রূপজীবিনী নারীরা তাদের প্রাত্যহিক রেওয়াজ অনুযায়ী জীবিকার জন্য শিকার সংগ্রহার্থে এই সময় ঐ বাড়ির সদর দরজার গলিতে দাঁড়িয়েছিল। এইজন্য খোকাবাবু প্রথমবার যখন তাদের সেই বাড়িতে প্রবেশ করেছিল তখন তারা কেউই তাকে দেখতে পায়নি। কেষ্টবাবু সম্ভবত এই সময় খোকাবাবুর সঙ্গে পোশাক পরিবর্তনের জন্য খোকাবাবুর বাড়িতে এসে থাকবে। এরপর তারা তাড়াতাড়ি পোশাক পরিবর্তন করে সকলের অলক্ষ্যে বাড়ির ঐ পিছনের দরজা দিয়েই ঐ বাড়ি হতে বেরিয়ে পড়েছিল। বস্তুত পক্ষে ঐ বাড়ির পিছনের দরজা হতে অন্য এক আঁকা বাঁকা গলির পথ ধরে বড় রাস্তায় বেরিয়ে আসা যায়। এর পর তারা পথের মধ্যে কোনও পানের দোকান হতে পান কিনে তা খেয়েছে। উত্তেজনার বশে বেশি পান খাওয়ার জন্যে খোকাবাবুর নীল শার্টে পানের পিচ লেগে গিয়ে থাকবে। এরপর তারা ভূপেনের বাড়ি এসে মলিনা সেখানে এসেছে কিনা তা দেখে যায়। এরপর সেখান থেকে খোকাবাবু কেষ্টবাবুকে নিয়ে ঐ মেথর গলিতে পুনরায় ফিরে গিয়ে পাগলার মুণ্ডটা কেটে নিয়েছে। খোকাবাবু একাই সম্ভবত এই মুণ্ডকর্তন রূপ কার্যটি সমাধা করে। এই জন্য মাত্র তারই জামাতে রক্ত লাগে। এইজন্য খোকাবাবুকে পুনরায় পোশাক পরিবর্তন করতে হয়েছিল। কেষ্টবাবু এইসময় দূরে দাঁড়িয়ে

থাকায় তার জামা কাপড়ে রক্ত লাগেনি। এইজন্য খোকার সঙ্গে সে দ্বিতীয়বার কৃপানাথ লেনে এলেও পোশাক পরিবর্তনের জন্য খোকার সঙ্গে ঐ বাড়তে না ঢুকে সে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। পাগলার মুণ্ডকর্তন করে ঐ মুণ্ডসহ তারা গঙ্গার ধারে এসে গঙ্গার জলে ঐ কাটা মুণ্ডটা ফেলে দিয়ে চলে আসে। সম্ভবত মুণ্ডকর্তনের সময় খোকাবাবুর জুতাজোড়াটি রক্তে ভিজে গিয়েছিল। এই জন্য পোশাক পরিবর্তনের জন্য তার কৃপানাথ লেনে ফিরে আসবার সময় সে তার জুতা দুটো কোথাও ফেলে দিয়ে নগ্নপদে সেখানে ফিরে এসেছিল। এইজন্য সাক্ষী দেবেনবাবু খোকাবাবুকে ঐ সময়ে নগ্নপদে ফিরে আসতে দেখেছিল। তবে দেবেনবাবু খোকাবাবুর শার্টের উপর এই সময় রক্তের দাগ দেখেছিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বার না হলে অত রক্ত খোকার শার্টে লাগতে পারে না। অথচ মৃত ব্যক্তির গাত্র হতে ফিনকি দিয়ে রক্ত উপরে উঠে না। কিন্তু ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট হতে আমরা জেনেছি যে ছুরিকাহত হ'য়ে বেহুঁশ হলেও পাগলা তখনও মরেনি বস্তুত পক্ষে জীবিত অবস্থাতেই পাগলার মুণ্ডটি কেটে নেওয়া হয়েছিল এইজন্য তার দেহ হ'তে ফিনকি দিয়ে রক্ত উঠে খোকার শার্টটি রক্তরঞ্জিত করেছিল। এইরূপে দুইবার রক্তরঞ্জিত পোশাক-পরিচ্ছদ এদের পরিবর্তনের প্রয়োজন হওয়ায় আমরা দুই প্রস্থ রক্তরঞ্জিত পোশাক-পরিচ্ছদ খোকার নিজ বাড়ি এবং তার ধোপার বাড়ি হতে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি।

আমরা উপরোক্ত রূপ এক স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হলেও তখনও পর্যন্ত উহার অনুকূলে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারিনি। কয়েকটি সূত্রের উপর নির্ভর করে আমরা মাত্র এইরূপ এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম। কিন্তু সূত্র সমূহ সকল ক্ষেত্রে প্রমাণ রূপে বিবেচিত হয় নি। সূত্র সমূহ অনুমানের সাহায্যে অপরাধ নির্ণয় কার্যে সহায়ক

হয় মাত্র। উহার দ্বারা কোনও এক অপরাধ কখনও সম্যকরূপে প্রমাণিত হয় না। বস্তুতপক্ষে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য আমরা সাক্ষ্য প্রমাণের সহিত কিছুটা অনুমানের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এই জন্য আমরা আমাদের এই পরিসংজ্ঞা বা থিওরিটি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণের জন্য আরও তদন্ত কার্যে মনোনিবেশ করি।

যে কোন কারণেই হোক আমাদের সহজাত বুদ্ধি বা ইন্‌স্টিঙ্কট্ বলছিল যে গোপীবাবুই ছিলেন এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সেকেণ্ড-ইন্-কমাণ্ড এবং কেষ্টবাবু ছিলেন থার্ড-ইন্-কম্যাণ্ড। আমাদের অন্তরাত্মা এ'কথাও বলছিল যে খুব সম্ভবত গোপী ও কেষ্ট পাগলাকে দুই দিক হতে শক্ত করে ধরে রেখেছিল এবং খোকাবাবু নিজে তাকে ছুরিকাহত করে হতচেতন করে দিয়েছিল। আমাদের আরও মনে হচ্ছিল যে সুবল, ভূপেন প্রভৃতি দলের অন্যান্য ব্যক্ত ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে শুধু পাহারারত ছিল।

বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে ইনটেলিজেন্স বা বুদ্ধিবৃত্ত ভুল করলেও মানুষের সহজাত বুদ্ধি বা ইন্‌স্টিঙ্কট্ ভুল করেনি। মানুষের প্রোফেশ্যন্যাল বা পেশাগত ইন্‌স্টিঙ্কট্ সম্বন্ধে এ'কথা বিশেষ রূপে প্রযোজ্য। এমন অনেক ডাক্তার আছেন যাঁরা রোগীকে পরীক্ষা না করে শুধু তাকে দেখে বলে দিতে পেরেছেন যে তার এই এই রোগ হয়েছে। পরে বিবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পর তাঁদের এই অনুমান সত্য রূপে প্রতীত হয়েছে। এমন বহু ফুল বিক্রেতাকে আমি জানি যে খরিদ্দারকে দেখামাত্র বলে দিতে পেরেছে যে সে ফুল নেবে কি না এবং নিলে সে এর জন্য কতো দাম দিতে পারবে। এমন বহু পুলিশ অফিসার আছেন যাঁদের কাছে ১২জন সন্দেহজনক গৃহ-ভৃত্যকে হাজির করার পর তিনি তাদের মুখের দিকে শুধু কয়েকবার মাত্র তাকিয়ে বলে দিতে পেরে-

ছেন যে এদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দিন ঐ বাড়িতে চৌর্যকার্যে লিপ্ত ছিল। পরে ঐ লোকটির কাছ হতে অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, ঐ লোকটিই যে চোর ছিল তা তিনি জানলেন কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে ঐ অফিসারটি শুধু এইমাত্র বলেছেন যে তাঁর মন (ইন্‌স্টিঙ্কট্) বলছিল, তাই তিনি এই কথা বলেছেন। কোনও পুলিশ অফিসার যদি উকিল, ব্যবসায়ী, ডাক্তার প্রভৃতির ন্যায় পুলিশি কার্যকে শুধু চাকরি হিসাবে গ্রহণ না করে শুধু উহাকে তাঁদের একটি প্রফেশ্যন রূপে মনে করেন তাহলেই মাত্র তাঁরা এইরূপ প্রফেশ্যন্যাল ইন্‌স্টিঙ্কট্ অর্জন করতে সক্ষম হবেন।

এইরূপ এক ইন্‌স্টিঙ্কট্ বা সহজাত প্রেরণা আমি ও সুনীলবাবু বারে বারে অনুভব করছিলাম। অন্ধকারে পথ খুঁজে না পেলে এই ইন্‌স্টি-ঙ্কটের সাহায্য নেওয়া আমাদের নিকট অপরিহার্য ছিল। আমাদের এই ইন্‌স্টিঙ্কট্ এই মামলার অন্যতম খুনী আসামী কেষ্টবাবু এবং গোপীনাথকে সর্বাগ্রে খুঁজে বার করবার জন্যে আমাদের নির্দেশ দিল। আমাদের মন বারে বারে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছিল যে এই দুইজনের একজনের বিবৃতির উপরই সমগ্র মামলাটির সাফল্য নির্ভর করছে। ইতিমধ্যে আমরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করছিলাম যে এদের প্রত্যেকেরই এক একজন করে রক্ষিতা আছে। এরা সাধারণত তাদের ওখানেই রাত্রিবাস করে থাকে। আমরা ইতিপূর্বে মলিনা প্রভৃতি সাক্ষীর মুখে শুনেছিলাম যে খুনের রাত্রে ভূপেনবাবুর রক্ষিতার বাড়িতে এসে খোকা-বাবু মলিনাকে দেখে বেরিয়ে যায় এবং তারপরে সেখানে রাত্রি ১টার সময় পুনরায় ফিরে আসে। এরপর প্রত্যুষে উঠে খোকা মলিনাকে তাদের উত্তরপাড়ার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেখানে তাকে রেখে আসে। এই কারণে আমরা অনুমান করে নিতে পারলাম যে গোপীবাবুও নিশ্চয়ই এই রাত্রে একটার সময়ই তার রক্ষিতার বাটীতে ফিরে এসেছিল এবং

তারপর প্রত্যূষে উঠে সে তার রক্ষিতাকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছে। এইরূপ এক অনুমানের উপর নির্ভর করে আমরা মধ্য ও উত্তর কলিকাতার বেশ্যা-পল্লী অঞ্চলে খোঁজ করতে লাগলাম যে ঐরূপ কোনও নারী ঐ দিন ভোর রাত্রে তার উপপতির সহিত তাদের ঘরে তালা বন্ধ করে অন্য কোথায়ও চলে গিয়েছে কিনা? আমাদের অনুমান আদপেই মিথ্যা হয়নি। বহু অনুসন্ধানের পর আমাদের ইনফরমার তিনকড়ির সাহায্যে গোপীনাথ সেন লেনের এক বাসিন্দা বলাই দাস নামক রূপজীবিনী-বিলাসী জনৈক ব্যক্তিকে আমরা খুঁজে বার করলাম। জিজ্ঞাসাবাদের পর এই ব্যক্তির নিকট আমরা ঠিক এইরূপ একটি ঘটনা ঐ তারিখে ভোর রাত্রিতে তাদের বাড়িতে ঘটেছে বলে জানতে পেরেছিলাম। এই সম্পর্কে নিম্নে সাক্ষী বলাই দাসের বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ লিপিবদ্ধ করা হলো।

"আমার নাম শ্রীবলাইচন্দ্র দাস। আমি ৺নরেন দাসের পুত্র। ৮ঠা সেপ্টেম্বর (খুনের রাত্রে) রাত্র একটায় গোপীনাথ সদর দরজায় ধাক্কা-ধাক্কি করতে থাকে। আমি বাড়িউলী মানদারাণীর নির্দেশে নিচে নেমে দরজা খুলে দিলে গোপীনাথ ঐ গৃহে প্রবেশ করে। গোপীনাথ এই বাড়ির অন্যতম বাসিন্দা ডলিরাণীর উপপতি। সে ডলির সঙ্গে বসবাস করলেও প্রায়ই রাত্রে গরহাজির থাকে। অন্যথায় সে রাত্র দশটার মধ্যেই ডলিরাণীর ঘরে ফিরে আসে। এই রাত্রে তার জামার উপর আমি রক্তের দাগ দেখি। আমি এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে বলে যে মদের ঝোঁকে পড়ে গিয়ে সে আহত হয়েছে। এর পর সে তড় তড় করে সিঁড়ি বয়ে উপরে উঠে যায়। এক বাড়িউলী ছাড়া এ বাড়ির আর সব মেয়েদের বাঁধা বা টাইমের বাবু আছে। এখানকার কোনও মেয়ে ছুটা করে না। গোপীবাবু ডলিরাণীর বাঁধা-বাবু। অন্য কেহ ডলির ঘরে আজকাল আসে না। এ বাড়ির সদর দরজা রাত্র

১০টার পর বন্ধ হয়ে যায়। এর পর কেউ এলে আমি নিচে নেমে দরজা খুলে দিই। গোপীবাবুকে আমি ঐ রাত্রে এ বাড়িতে ঢুকতে দেখলেও সকালে কখন এ বাড়ি ছেড়ে সে চলে গেলো তা আমি দেখিনি। ওখানকার মেয়েদের মুখে শুনেছি যে সকাল ৫টায় সে ডলিবাণী ও তার মাকে নিয়ে এ বাড়ি থেকে চলে গেছে। আপনাদের ইনফরমার তিনকড়ি আমার বন্ধু। তার অনুরোধে আমি গোপনে থানায় এসেছি। ও বাড়ির বাড়িউলীসহ সকল মেয়ে গোপীবাবুর নিকট বহুভাবে উপকৃত। দায়ে-অদায়ে গোপীবাবু টাকা দিয়ে তাদের সাহায্য করে থাকে। এইজন্য ওখানকার মেয়েরা মরে গেলেও তার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলবে না। আমি বাড়িউলীর ঘরে থাকি। তেনাই আমার ভরণ-পোষণ করেন। বাড়িউলীর বয়স ৩৫ এবং আমার বয়স ২০ হলো।"

এই সাক্ষী বলাইচন্দ্র দাসের উপরোক্ত বিবৃতিট আসামী গোপী-নাথের বিরুদ্ধে এক অকাট্য প্রমাণ রূপে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ঐ বাটীর বাসিন্দা রূপজীবিনীদের কয়েকজন তাকে সমর্থন করে বিবৃতি দিলে তো আর কথাই নেই। এইজন্য আমি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কয়েকটি তথ্য জেনে নিই। নিম্নে উদ্ধৃত প্রশ্নোত্তরগুলি এই বিষয়ে বিশেষ রূপে প্রণিধানযোগ্য।

প্রঃ—বাবা, টাইম ও ছুটা কাকে বলে? তুমিই বা বাড়িউলীর বাড়ি থাকো কেন? তুমি নিজে কি কাজ করো? কোনও বিষয় গোপন না করে সত্য কথা বলো।

উঃ—এখানকার পেশাবতী নারীদের তিন রকমের উপপতি বা বাবু আছে। যথা, (১) ছুটা অর্থাৎ যারা যাকে তাকে অর্থের বিনি-ময়ে কক্ষে স্থান দেয়। (২) টাইমের, অর্থাৎ যারা দুই বা তিন ব্যক্তিকে মাত্র আমল দেয়। অর্থাৎ একজন হয়তো এলো সোম ও

মঙ্গলবার এবং অপরজন হয়তো এলো বুধ ও শুক্রবার এবং তৃতীয় জন হয়তো এলো শনি ও রবিবার। এমনি নিয়মিত এদের বাবুরা আসা-যাওয়া করে। অজানা ও অচেনা কাউকে এরা কক্ষে কখনও স্থান দেয় নি। (৩) বাঁধা, অর্থাৎ যারা স্বামী-স্ত্রীর মতন থাকে। এক কথায় একজনেরই মাত্র ভাত খায়। অন্য কারুর দিকে এরা ফিরেও তাকায় না। তবে আমার সঙ্গে বাড়িউলীর অন্য রকমের সম্পর্ক। আমরা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসি। আমার কোনও চাকুরি-বাকুরি নেই। বাড়িউলী আমাকে তা করতেও দেয় না। এর বেশি আমি আপনাদের আর কিছু বলতে পারবো না। আপনারা আমার নমস্য গুরুজনস্থানীয়। এ' সব কথা তাই আপনাদের কাছে বলতে আমার লজ্জা করে। বেশ্যা-নারীরা বেশ্যা হলেও তারা নারী। এইজন্য মধ্যে মধ্যে তাদেরও মনের মানুষের প্রয়োজন হয়। এর বেশি আর আমাকে আপনারা কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। বাড়িউলীর উপপতিদের কেউ তার ঘরে এলে আমি সেই সময় পাশের ঘরে সরে যাই। আজ্ঞে, এতে লজ্জার কি আছে? আমি খামকা তার পেশার ব্যাপারে বাধা দিতে যাব কেন? তবে বাড়িউলী ওপরের ঘরে থাকেন বলে তিনি গোপীবাবুদের সম্বন্ধে কোনও খোঁজ-খবর রাখেন না। তাঁকে আর এই সব ব্যাপারে আপনারা জড়াবেন না। সাক্ষী-টাক্ষী যা দেবার তা তাঁর হয়ে আমিই দেবো, বাবু।

উপরের এই সংবাদ অনুযায়ী আমি তৎক্ষণাৎ ঐ বাড়িতে এসে ওখানকার বেশ্যা নারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকি। কিন্তু আমাকে দেখে এরা সভয়ে এ'ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে মাত্র। বহু পীড়াপীড়ি করেও এদের নিকট আমি একটি মাত্রও প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি নি। আমার এই অক্ষমতা সম্বন্ধে ঐ দিনের মামলা সম্পর্কীয় স্মারকলিপিতে আমি একটি বিবৃতিও লিপিবদ্ধ করি।

আমাদের ইন্সপেক্টার সুনীলবাবু ছিলেন একজন প্রাচীনতম অফিসার। তিনি আমার নিকট হতে এই সব কথা শুনে বললেন, 'ঠিক আছে। তুমি গিয়েছিলে সেখানে পুলিশ অফিসার রূপে। এই জন্য তারা কেউই তোমার কাছে কো-ও স্বীকারোক্তি করেনি। এইবার আমি সেখানে যাবো ছদ্মবেশে তাদের একজনের উপপতিরূপে। এইবার দেখবো তাদের কাছ হতে প্রকৃত সত্য সংগ্রহ করা যায় কিনা?' আমি অবাক হয়ে ইনস্পেক্টার সুনীল রায়কে বলেছিলাম, 'সে কি স্যার। এরা আমাকে কিছু বললো না, কিন্তু এরা আপনাকে সব কথা বললো—এই তথ্য আদালতে পেশ করলে তো জুরিরা আমাদের দুজনার কাউকেই বিশ্বাস করবে না। অবশ্য যদি আপনি আদালতে বলতে পারেন যে সেখানে আপনি তাদের উপপতিরূপে গিয়েছিলেন তাহলে তা স্বতন্ত্র কথা।' কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হয়ে ইনসপেক্টার রায় আমার এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'য়ুরোপে যদি যুবতী নারীরা শত্রুপক্ষের জেনারেলদের উপপত্নী হয়ে থেকে স্বদেশের জন্য গোপন তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এসে স্বদেশবাসীর নিকট যশস্বী হতে পারেন, তাহলে একটি সাংঘাতিক মামলার কিনারা করার জন্য এইরূপ এক ব্যবস্থা যদি আমি গ্রহণ করি, তাতে আর আমার লজ্জার কি আছে? তা ছাড়া আমি একজন পুলিশ অফিসার ও সেই সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষও তো বটে।' এই দিনই ইন্সপেক্টার রায় দিশী ধুতি, হীরার অঙ্গুরী ও সোনার ঘড়ি পরে ও সিল্কের পাঞ্জাবি ও ওড়না গায়ে দিয়ে ও লপেটা পামসু পরে সারা গায়ে উগ্র সেণ্ট মেখে হাতির দাঁতের ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে ঐ বেশ্যাবাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন। এরপর সেখানে সারারাত্র বাস করে সেখানকার তিনটি বেশ্যানারীর নিকট হতে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি সংগ্রহ করে তবে ফিরে এসেছিলেন।

"আমরা তিনজনেই এই বাড়িতে নিজ নিজ ঘরে পেশা করি।

আমাদের বাঁধা বাবু নেই। টাইমের বাবু দু'জন থাকলেও মাঝে মাঝে আমরা ছুটাও করে থাকি। আমরা সকলেই গোপীবাবু নামে একজন ফরসা রঙের মানুষকে চিনি। সে ঐ উত্তর দিককার একখানা ঘরে তার বাঁধা স্ত্রীলোক ডলিরাণীকে নিয়ে বাস করতো। ৫ই সেপ্টেম্বর (খুনের রাত্রে) ভোরবেলায় আমরা ডলিরাণীকে একটি জামা ও একটি ধুতি তার ঘরের বারান্দায় বালতির জলে ডুবিয়ে পরিষ্কার করতে দেখেছি। ঐ বালতির সব জলটা লাল হয়ে উঠেছিল। ডলিরাণীকে জিজ্ঞেস করায় সে বলে গোপীর অর্শের রোগ আছে। এর কিছু পরেই গোপী ডলিরাণী ও তার মা'কে নিয়ে তাদের দু'টা ঘরেরই তালা বন্ধ করে কোথায় চলে গিয়েছে। তাদের এখনকার বাড়ির ঠিকানা আমরা জানি না।"

পরদিন সকালবেলা আটটার সময় ইনস্‌পেকটার সুনীল রায়ের নিকট হতে উপরোক্ত সংবাদ পেয়ে আমি তাঁর নির্দেশ মত আসামী গোপীনাথের রক্ষিতার ঐখানকার ঘর দুইটি তল্লাস করবার জন্য যথাশীঘ্র রওনা হ'য়ে গেলাম। ঘর দুইটি তালাবন্ধ থাকায় তালা ভাঙবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও আমি সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে উপস্থিত হয়ে ঐ ঘর দুইটির তালা ভাঙবার আমার কোনও প্রয়োজন হয় নি। আশাতীত ভাবে আমি দেখতে পেলাম যে ওদের দুইটি ঘরই খোলা এবং সেখানে ডলিরাণী ও তার মাতাঠাকুরাণী জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে পুঁটলি-পোঁটলা বাঁধছে। একটু দেরি করলে এরা একেবারে আমাদের নাগালের বাইরে চলে যেত আর কি? আমি জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে ঐ ঘরে উপবিষ্টা মসীবর্ণা কুরূপা যুবতীর নামই ডলিরাণী। ঐরূপ একটি কুৎসিত নারীর ঐরূপ একটি সুন্দর নাম আমার সেইদিনকার তরুণ মন আদপেই পছন্দ করেনি। আমি একরকম ক্ষেপে উঠে তাকে উদ্দেশ করে বলে উঠেছিলাম, 'কে তোমার এই নাম

রেখেছে?' ভীতত্রস্তা হয়ে ডলিরাণী বলে উঠলো, 'আমার মা।' তার এই উক্তিতে আমি আঁৎকে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা! ইনি তোমার মা?' এরপর অলক্ষ্যে আমার মুখ হতে বেরিয়ে এলো, 'এই পাকড়ো ইনকো।' আমার এই হুহুঙ্কার অভিনয়ের ফল ফলতে একটুও দেরি হয়নি। ভীতা ত্রস্তা হয়ে একরকম কাঁপতে কাঁপতেই ডলিরাণীর বৃদ্ধা মাতা বলে উঠলো, 'আমাদের কেন ধরবে বাবা। আমরা তোমাদের গোপীর হাওড়ার নূতন বাসা এক্ষুণি দেখিয়ে দিচ্ছি।' আমি এইবার আমাদের আশু কর্তব্য সম্বন্ধে একটু দোটানায় পড়ে গেলাম। এক্ষুনি এদের নিয়ে গোপীকে ধরবার জন্য হাওড়ায় চলে যাবো, না প্রথমে ডলিরাণীর নিকট একটি বিবৃতি এখানেই লিপিবদ্ধ করে নেবো? গোপার সামনে সে নিশ্চয়ই সত্য কথা বলতো না। বরং তার মনোবল আরও বেড়ে যেতো। পরিশেষে চিন্তা করে ডলিরাণীর নিম্নোক্ত রূপ একটি বিবৃতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে নিলাম।

'৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৬—রাত্র আন্দাজ এক ঘটিকার সময় [ইং মতে রাত্র ১২টার পর তারিখ বদলায়] আমার দয়িত গোপীবাবু আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলো। এই সময় আমি দেখতে পেলাম যে সে প্রচুর মদ্যপান করেছে। এই অবস্থায় তাকে আমি দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আচ্ছা! তোমার ফিরতে আজ এতো দেরি হলো কেন?' আমার এই প্রশ্নে গোপীবাবু ক্ষেপে উঠে উত্তর করলো, 'চুপ কর শালী! একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। কাল সকালে খবরের কাগজে দেখতে পাবি।' পরদিন প্রত্যুষে আমি তার ধুতিতে রক্তের দাগ দেখতে পাই। এই থেকে আমি বুঝতে পারি যে রাত্রে একটা খুন-খারাপি হয়ে গিয়েছে। গোপীবাবুর অনুরোধে আমি কাপড়খানা এক বালতি জলে ডুবিয়ে পরিষ্কার করে ফেলি। এর পরই গোপী আমাকে নিয়ে হাওড়ার একটা বাসাবাড়িতে এনে তুলে। আমার মাও আমার

সঙ্গে সেইখানে চলে আসে। আজকে আমি মার সঙ্গে এখানে এসেছি এখানকার সব জিনিসপত্র ও বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে। সেই কাপড়টা আমি ধোপার বাড়ি না দিয়ে হাওড়ার বাড়িতে একটা বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছি। এ ছাড়া ঐ খুন সম্বন্ধে আমরা আর কোনও খবরই আপনাদের দিতে পারি না।"

এর পর আমি সাক্ষীদের সামনে গোপীর ঘর দু'টি ভালো করে তল্লাস করি, কিন্তু সেখানে আপত্তিকর কোনও দ্রব্য পাওয়া যায়নি। এরপর ডলি ও তার মাকে নিয়ে আমি নেমে আসছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম যে একটি ফরসা রঙের ছোকরা উপরে উঠছে। ছোকরাটি আমাদের দেখামাত্র দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আমি তার পিছু পিছু তাড়া করে তাকে ধরে ফেললাম। তার গায়ের রঙ ও চেহারা দেখে ইতিপূর্বেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল যে, সে গোপীবাবুর ছোট ভাই সুদাম। ডলি ও তার মার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে গোপী তাকে এখানে খবর নেবার জন্যে পাঠিয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ ডলি ও তার মাকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে থানায় রেখে মাত্র গোপীর ভাই সুদামকে নিয়ে হাওড়ায় রওনা হয়ে পড়ি। বলা বাহুল্য যে, থানায় ফিরে এসে সেখান থেকে এক ট্রাকভর্তি সশস্ত্র সান্ত্রীও আমরা সঙ্গে নিয়েছিলাম।

গোপীর ভাই সুদাম নিজেই আমাদের পথ দেখিয়ে তার দাদার হাওড়ার নূতন বাসা-বাড়িটি দেখিয়ে দিয়েছিল। এই ভাবে তার দাদাকে ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া তার গত্যন্তরও ছিল না। তা ছাড়া এতে তার দাদার কিরূপ বিপদ ঘটতে পারে, সে সম্বন্ধে তার কোনও সঠিক ধারণা ছিল না। আমরা ত্বরিতগতিতে সশস্ত্র সিপাহী-শান্ত্রীর সাহায্যে গোপীর ঐ বাড়িটা ঘেরোয়া করে ফেললাম। বাড়ির দরজা বার হতেই খোলা ছিল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, গোপীনাথ একটা তক্ত-

পোশের উপর অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমরা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ামাত্র সে তড়াং করে উঠে পড়ে তক্তপোশের পাশ হতে একটা ভোজালি বার করে আমাদের দিকে তেড়ে এলো। আমরা পূর্ব হতেই প্রস্তুত থাকায় তিন-চারটা টোটা-ভরা রিভলভার ক্ষণিকের মধ্যে তার দিকে উঁচিয়ে ধরতে পেরেছিলাম। বেগতিক বুঝে গোপীনাথ ভোজালিটা বিছানার উপর রেখে ধরা দেবার জন্যেই যেন আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমরা আমাদের পিস্তল কয়টি পুনরায় পকেটে পুরামাত্র সে আমাদের উপর শুধু হাতেই ঝাঁপিয়ে পড়লো। এরপর আমাদের মধ্যে শুরু হলো ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি। এতে আমাদের মধ্যে দুই-একজন আহত হলেও গোপী নিজেই অধিক আহত হয়েছিল। কিন্তু সে যে সেদিন ইচ্ছে করেই আহত হয়েছে, তা আমি সেইদিন আদপেই বুঝতে পারিনি। পরদিন হাকিমকে নিজের দেহের আঘাত দেখিয়ে পুলিশ হেপাজতি এড়িয়ে জেল হেপাজতিতে যাবার জন্যে সে সুপরিকল্পিত ভাবে এইরূপ ধ্বস্তাধ্বস্তিতে আহত হতে চেয়েছিল। পাছে পুলিশ হেপাজতিতে থেকে তাকে একটা স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি দিতে হয়, তার জন্য তার এ ছিল একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। যাই হোক, আমরা দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর সম্মুখে গোপীবাবুর ঐ বাড়ির ঘর কয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাসী করে একটি বাক্স থেকে তার রক্ত-ধৌত কাপড়খানি উদ্ধার করতে সমর্থ হই। তখনও পর্যন্ত (ধোয়া সত্ত্বেও) তাতে সামান্য সামান্য রক্তের চিহ্ন লেগে ছিল। এ ছাড়া ঐ ঘরের অপর একটি বাক্স থেকে আমরা একটি গণৎকারের ছক-আঁকা কাগজও উদ্ধার করতে পারি। এই পত্রিকাখানি হতে বুঝা যায় যে গোপীবাবু ইতিমধ্যে এক গণৎকারের কাছে ভাগ্য গুনিয়ে এসেছে। ঐ কাগজের টুকরাটিতে লেখা ছিল যে 'অতো তারিখের মধ্যে গোপীবাবু পুলিশের হাতে ধরা না পড়লে তার আর কোনও বিপদের আশঙ্কাই থাকবে না।' দুর্ভাগ্যক্রমে

ঐ নির্ধারিত তারিখের পূর্বেই গোপীবাবুকে আমাদের হাতে ধরা পড়তে হলো।

গোপীবাবুকে সঙ্গে করে থানায় এনে দেখলাম ইন্‌স্পেক্টার রায় নিবিষ্ট মনে এই মামলার কল্যকার তদন্ত সম্পর্কে স্মারকলিপি লিপিবদ্ধ করতে মহাব্যস্ত! আমাদের তাঁর কক্ষে ঢুকতে দেখে তিনি উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, 'যাক্। পেয়ে গিয়েছো ওকে তাহলে। তুমি ওকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দাও। আমি ততক্ষণ এই মামলার লেখাপড়ার কাজটা সেরে ফেলি।' আমি গোপীকে তাঁর নিকট পেশ করে বললাম, 'এখুনি একে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারলে তো ভালোই হতো; কিন্তু আসামী ভীষণভাবে জখম হয়েছে। ওকে একবার হাসপাতালে পাঠানো এখুনি দরকার। এছাড়া আমরাও তার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে আহত হয়ে পড়েছি। শেষে কি ওর সঙ্গে আমরাও টিটেনাস হয়ে মারা যাবো!' প্রত্যেক পুলিশ অফিসারেরই ফার্স্ট এইড সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকে ইন্‌সপেক্‌টার রায় তাড়াতাড়ি আলমারি খুলে তুলো, আইডিন প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের একটু প্রাথমিক শুশ্রূষা করে বললেন, 'আচ্ছা। তাহলে এখন তোমরা হাসপাতালে যাও'। হাসপাতাল থেকে যথারীতি নিজেদের ও সেই সঙ্গে আসামীরও পট্টি ধরিয়ে ফিরে এসে আমি গোপীবাবুকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। কিন্তু কিছুতেই সে এই খুনের তদন্তে আমাদের সাহায্য করতে রাজি হলো না। তবে সে একবার মাত্র দম্ভোক্তি করে আমাদের বলেছিল, 'আজ্ঞে হাঁ। আমি ও কেষ্ট পাগলার দুই হাত চেপে ধরি। আর সেই সুযোগে খোকা সম্মুখ থেকে তার বুকে ছুরি বসায়। আমাদের সঙ্গে সুবল ও কালী প্রভৃতি আরও কয়েকজন সেখানে উপস্থিত ছিল। তারা সাক্ষাৎ-ভাবে খুনের ব্যাপারে কোনও প্রকারে আমাদের সাহায্য করে নি। তবে পাগলাকে ট্যাক্সি করে ধরে আনবার সময় তারা আমাদের

সাহায্য করেছিল।' এইটুকু মাত্র স্বীকার করে হঠাৎ কি ভেবে গোপীবাবু তড়াং করে লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। আশে-পাশের অফিসার ও সিপাহীরা সতর্ক হয়েই তাকে ঘিরে রেখেছিল। পালাবার কোনও উপায় না দেখে সে আমাদের গাল পাড়তে পাড়তে চীৎকার করে বললো, 'না না না। আমি আর একটি কথাও আপনাদের বলবো না।' এর পর আমরা তাকে অনেক বুঝালাম ও অনুনয় করলাম, কিন্তু ভবি কিছুতেই ভোলবার নয়। আমরা কিছুতেই তার কাছ হতে খোকাবাবু ও কেষ্ট-বাবুর ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারলাম না। আমি তখন গোপীকে লক-আপে পুরে দিয়ে আমার সহকারীদের বুঝিয়ে বললাম, যে, এর কাছ হতে এক্ষণে আর একটি কথাও বার করা যাবে না। একে এখন খুন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিরর্থক। এজন্য আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে।

আমার এইরূপ অভিমতের মধ্যে একটি বিশেষ বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত ছিল। অভিজ্ঞতা হতে আমি জেনেছিলাম যে এই সকল পুরাতন অপরাধীরা এক অসাধারণ মানসিক অবস্থার সন্ততি। এদের বিবিধ সুকুমার বৃত্তি কালক্রমে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে এদের মধ্যে মাত্র অলসতা, ভাবপ্রবণতা, দাম্ভিকতা এবং নিষ্ঠুরতা রূপ বৃত্তি চতুষ্টয় স্থুল ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। এরা উত্তেজিত হলে এদের এই বৃত্তি চতুষ্টয় এদের মনের পথে পর্যায়ক্রমে উঠা-নামা করে, অর্থাৎ কখনও এরা থাকে অলস, কখনও এরা হয় ভাবপ্রবণ, কখনও বা এরা নিষ্ঠুর হয়ে উঠে। এখন নিদারুণ উত্তেজনা একে এর মনের দাম্ভিকতার রাজ্য থেকে নিষ্ঠুরতার রাজ্যে এনে ফেলেছে। এইজন্য আমি বুঝতে পারলাম যে পুনরায় ভাব-প্রবণতার রাজ্যে উপনীত না হলে এর কাছ হতে কোনও স্বীকারোক্তি আদায় করা অসম্ভব। এই জন্য আমি বিবৃতির জন্য গোপীনাথকে আর একটু মাত্রও পীড়াপীড়ি করা উচিত মনে করিনি।

আমার এই ধারণা অমূলক ছিল না। এই জন্য পরদিন আদালতে তাকে হাজির করার সময় পর্যন্ত তার নিকট হতে আর একটি সংবাদও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এর কারণ ঐ সময় পর্যন্ত সে তার মনের নিষ্ঠুরতার রাজ্যে অবস্থান করছিল। এদিকে কানুন মত গ্রেপ্তারের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে আমরা আদালতে উপস্থিত করতে বাধ্য। পর দিন তাকে আদালতে পেশ করা মাত্র সে তার জখমের জন্য পুলিশকে দোষী করে একটি বিবৃতিও দেয়। এর পর হাকিম বাহাদুর তাকে পুলিশ হেপাজতিতে না রেখে জেলহাজতে প্রেরণ করায় তাকে আর আমরা এই তদন্ত সম্পর্কে বিশেষ কোনও কাজে লাগাতে পারিনি। এ ছাড়া এই সময় পর্যন্ত খুন সম্পর্কে তার বিরুদ্ধে অকাট্য কোন প্রমাণও আমরা দাখিল করতে পারিনি। এইজন্য আদালতের এই আদেশ আমাদের মেনে নেওয়া ভিন্ন আর কোনও উপায়ও ছিল না। তবু মন্দের ভালো এই যে গোপীবাবু জামিনে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এই কারণে আমরা বরং খুশি হয়েই সেইদিন আদালত হতে থানায় ফিরেছিলাম। কিন্তু তদন্তকার্যে আর দেরি করা যায় না। তাই আমি ফিরে এসে দু' মুঠো মাত্র অন্ন মুখে পুরে সুবল ও কালীর সন্ধানে পুনরায় থানা হতে বেরিয়ে পড়লাম।

এক সুবল ও কালীর ডেরা খুঁজে বার করা আমাদের পক্ষে কঠিন হলেও তা অসম্ভব হয়নি। এদের জন্য কয়েকটি সম্ভাব্য স্থানে হানা দেওয়ার পর আমরা পরিশেষে মানিকতলা অঞ্চলের একটি বস্তি গ্রামের মধ্যস্থলে এসে উপস্থিত হলাম। এখানে যখন আমরা পৌছলাম, রাত্রি তখন একটা বেজে গিয়েছে। সাবধানে সারা বস্তিটি ঘেরাও করে উহার মধ্যকার উঠানে এসে দাঁড়ানো মাত্র আমরা সহসা একটা ঝুপ্ করে আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমাদের অন্যতম ইনফরমার রাধানাথ আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। সে একটি ঘরের চালের উপর দণ্ডায়মান

একটি মনুষ্যাকৃতির প্রতি আঙুল দেখিয়ে একরকম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতেই বলে উঠলো, 'হুজুর! খাঁদা—আ।' আমাদের সকলেরই জানা ছিল যে, খাঁদা ওরফে খোকার হাতে সকল সময়েই একটি গুলি-ভরা পিস্তল থাকে। আমাদের এ-ও জানা ছিল যে, সে নিমেষে শত্রুনিধনে সর্বদাই তৎপর থাকে। একথা সত্য যে বিপদে ধৈর্যহারা হওয়া বিচক্ষণ পুলিশ অফিসারের পক্ষে অনুচিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মুখ হ'তে বার হয়ে এলো,—ফায়ার। আমাদের থানার সার্জেণ্ট গ্রাণ্ট্ সাহেব আমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। হুকুম পাওয়া মাত্র সে তার পেটি হতে টোটাভরা পিস্তল বার করে লোকটিকে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি দুইবার গুলি করলে। চারিদিককার রাত্রিকালীন নিস্তব্ধতা ভেদ করে আওয়াজ হলো,—দড়াম, দড়াম। আমরা সকলে লক্ষ্য কমলাম যে চালের উপরকার লোকটা উপর থেকে ঝুপ করে নীচের উঠানে গড়িয়ে পড়লো। আমরা লোকটাকে ঘিরে তার উপর টর্চের আলো ফেলার পর আমাদের ইন্‌ফরমার জানালো যে লোকটা আদপেই খেঁদা নয়। এমন কি ঐ লোকটা খেঁদার কোনও সাকরেদ কি'না তাও সে জানে না। আমি বিব্রত হয়ে সার্জেণ্ট গ্রাণ্টকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি না দেখে গুলি করলে কেন?' গ্রাণ্ট সাহেব তার সকল দায়িত্ব এড়িয়ে আমার প্রশ্নের উত্তরে বললো, 'আপনি তো গুলির জন্য হুকুম দিলেন। তাই তো আমি একে গুলি করে মেরে ফেলেছি।' এইরূপ বিপদে আমি ইতিপূর্বে কখনও পড়িনি। খুনের তদন্ত করতে এসে নিজেই খুনের দায়ে পড়ে যাবো তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমাদের সঙ্গে গৃহতল্লাসীর জন্য বাহির হতে সাক্ষীরূপে আনা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছিলেন। পূর্বে তিনি কোনও এক জমিদারীর নায়েবরূপে বহুদিন কাজ করেছিলেন। এক্ষণে তিনি জনৈক মোক্তারের মুহুরীর কাজ করেন এবং এই বস্তিরই বহির্দেশের একটি কক্ষে সপরিবারে বাস করেন। ভদ্রলোক আমার

এই বিপদ দেখে একটি ছুরি কিনে মৃত ব্যক্তির হাতে সেটি গুঁজে দিয়ে রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্সের একটা প্রমাণ তৈরি করার জন্য আমাকে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁকে আমি সুস্পষ্ট রূপেই জানিয়ে দিলাম যে, যে কার্যের জন্য আমি দায়ী তার সম্মুখীন আমি নিজেই হবো, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এইরূপ কোনও জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় কিছুতেই নেবো না। এর পর আমরা মৃতমন্য ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করা মাত্র সে ধড়মড় করে উঠে বসে আমাদের সকলকে অবাক করে দিলে। আসলে সে ভয়ে কিছু-ক্ষণের জন্য বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। পিস্তলের একটি গুলিও তার গায়ে লাগেনি। এমন কি সে এজন্য মৃত্যুমুখেও পতিত হয় নি। লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে নিম্নস্বরে জানিয়ে দিলো যে, সুবল ও কালী ঐ বাড়িরই একটা ঘরে শুয়ে আছে। তাদের নির্দেশ মত সে সারা রাত্রি বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরের লোকদের নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিতো। পুলিশ দেখলে আগে ভাগে তাদের খবর দেবার জন্য তার উপর নির্দেশ ছিল। কিন্তু আমরা অতর্কিতে এসে পড়ায় সে পালাবার জন্যে চালের উপরে উঠে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, এই লোকটির বিবৃতি অনুযায়ী সুবল ও কালীকে গ্রেপ্তার করতে আমাদের একটু মাত্রও দেরি হয়নি। তবে এদের ঘর তল্লাসী করে খুন সম্পর্কে কোনও প্রামাণ্য দ্রব্য আমরা উদ্ধার করতে পারিনি।

থানায় এদের ধরে আনার পর খুন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে এরা স্বীকার করেছিল যে তারা পাগলাকে ধরে ঐ মেথর গলি পর্যন্ত পৌছে দিয়েছে মাত্র। এর পর গোপী, কেষ্ট ও পাগলাকে সেখানে রেখে খোকার নির্দেশে ঐ স্থান থেকে তারা না'কি চলে এসেছিল। যে কোনও কারণেই হোক আমার মনে হয়েছিল যে, এরা মিথ্যা বলছে। কিন্তু জানি না কেন ইন্‌সপেক্টার সুনীলবাবু তাদের এইটুকু বিবৃতিই সত্য বলে মেনে নিয়ে-

ছিলেন। তাঁর মতে এদের আর পুলিশ হেপাজতিতে না নিয়ে জেলহাজতে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো। খোকা ও কেষ্ট ধরা পড়ার পর এদের পুনরায় পুলিশ হেপাজতে নিলেই হবে। সেই সময় সত্য নিরূপণার্থে প্রকৃত বিবৃতি প্রদানের জন্য তাদের পীড়াপীড়ি করা যেতে পারবে। ইন্‌সপেক্টার সুনীলবাবুর মতে এরা কোনও ক্রমেই খোকাবাবুর দলের কোনও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হতে পারে না। এ'ছাড়া এমনি কতকগুলি আনইম্‌পর্টেণ্ট আসামী দ্বারা থানা ভর্তি করে রেখে তদন্তের ব্যাপারে সময় নষ্ট করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। অগত্যা ইন্‌সপেক্টার সুনীল রায়ের উপদেশ শিরোধার্য করে তাদের জেল হেপাজতিতে পাঠিয়ে আমি কেষ্টবাবু ও খোকাবাবুর সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলাম। কিন্তু এই সকল পলাতক আসামীর সন্ধান আমাকে কে বলে দেবে? ইতিমধ্যেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে বর্তমান দলটি খেঁদার অধীন বহু উপদলের মধ্যে একটি মাত্র উপদল। খোকাবাবু ইতিমধ্যে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যারও কয়েকটি স্থানে তার অপকার্যের জাল বিস্তার করেছে। অপকার্যের সুবিধার জন্য সে এখানে ওখানে কয়েকটি সুরক্ষিত ঘাঁটিও স্থাপন করেছে। খোকা বা খেঁদাকে যারা যারা জানে বা চিনে তারা সকলেই একমত যে, কয়েকটি প্রাণের বিনিময়ে তাকে মাত্র মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা সম্ভব। বিনা যুদ্ধে যে খোকাবাবু গ্রেপ্তার বরণ করবে না তা আমারও জানা ছিল। কিন্তু এইরূপ একটা নিদারুণ বিপদের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া আমার আর অন্য কোনও উপায়ও ছিল না।

এর পর তদন্ত সম্পর্কীয় নানা কাজে আরও কয়েকটি দিবস অতিবাহিত হয়ে গেল।

আমাদের বেতনভুক গোয়েন্দারা কলিকাতা ও হাওড়ার বহুস্থানে গিয়ে খোকা ও কেষ্টবাবুর জন্য খোঁজাখুঁজি করলো, কিন্তু তাদের গোপন

আস্তানা সম্বন্ধে তারা কোনও সংবাদই সংগ্রহ করে উঠতে পারলো না। হঠাৎ এই সময় খাঁদার বন্ধু হরিপদ সরকারের নামটি আমার মনে পড়লো। সাক্ষী দেবেনের মুখে এই হরিপদ সরকারের নাম আমরা ইতিপূর্বে শুনেছিলাম। ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৬, সকাল সাতটার সময় আমরা হরিপদ বাবুকে লোক মারফৎ ডাকিয়ে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলাম। হরিপদ খাঁদার ও কেষ্টর গ্রেপ্তারের জন্য আমাদের সাহায্য করতে দুইটি বিশেষ শর্তে রাজি হয়েছিল। তার প্রথম শর্ত ছিল এই যে, যদি প্রয়োজন হয় তো খোকাবাবুর গ্রেপ্তারের পূর্বদিন পর্যন্ত তাকে থানায় আশ্রয় দিতে হবে। তার দ্বিতীয় শর্ত ছিল এই যে, সদাসর্বদা তার সঙ্গে একজন সশস্ত্র সিপাহীকে তার দেহরক্ষী রূপে নিযুক্ত করতে হবে। আমরা তার এই উভয় শর্তেই রাজি হওয়ায় সে এই মামলার তদন্তে সাফল্যের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করতে সম্মত হয়েছিল। এই সময় আমি আমার কোআর্টারে একাই বসবাস করতাম। আমার অনুরোধে হরিপদবাবু এই দিনই তাঁর বিছানাপত্রসহ আমার কোআর্টারে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে আহার করতেন এবং সারারাত্র আমাদের সঙ্গে আসামীদের সন্ধানে হাওড়া, কলিকাতা ও চব্বিশ পরগনার নানা স্থানে ও অস্থানে ঘুরে বেড়াতেন।

আরও দিন দশেক এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় আমরা ইন্‌সপেক্টার সুনীল রায়ের সঙ্গে এই মামলা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। সুনীলবাবু আমাদের খুনের রাত্রের এক ঘটিকার সময়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের বোঝাচ্ছিলেন। তাঁর মতে এই খুনের পরিবৈশিক প্রমাণের জন্য এই রাত্রি এক ঘটিকা সময়টির মূল্য অসাধারণ। এই রাত্রে এক ঘটিকায় খোকা মলিনাকে নিতে আসে এবং এই রাত্রি এক ঘটিকাতে গোপীও ডলির বাড়ি ফিরে আসে।

ইনসপেকটার এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রমাণের কথা আমাদের বুঝিয়ে বলছিলেন। এমন সময় কুমারটুলি অঞ্চল হতে জন দশ বারো লোক হন্তদন্ত হয়ে থানায় এসে জানালো যে, খোকাকে তারা ওখানেতে সেই মেথরগলির খুনের জায়গাটার দিক হতে বেরিয়ে আসতে দেখেছে। থানার বাইরে বড়রাস্তার উপর সশস্ত্র সিপাহীসহ লরিটি তৈরি করে রাখা ছিল। আমরা তৎক্ষণাৎ সেই লরিটিতে উঠে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুমারটুলিতে এসে উপস্থিত হলাম। সেইখানে তখন পথচারীরা ভীত হয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করছিল। ইতিমধ্যে সেখানকার বাসিন্দারা আতঙ্কে তাদের বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়েছে। অনুসন্ধানে আমরা জানলাম যে, খোকা তার খুনের জায়গাটিতে তো এসেছিলই, তা ছাড়া সে তাদের কৃপানাথ লেনের বাসা-বাড়িতে এসে সেখানকার সাক্ষী ও সাক্ষিনীদেরও ধমকা-ধমকি করেও গিয়েছে। আমরা কিন্তু সারা রাত্রি ধরে কুমারটুলি অঞ্চলের প্রতিটি অলি-গলি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও খাঁদার কোন সন্ধানই পাইনি। পরদিন সকাল-বেলা আমরা খবর পেলাম যে, খোকাকে হাওড়ার একটা বস্তির একটি ঘরে আমাদের জনৈক গোয়েন্দা দেখে এসেছে। বলা বাহুল্য যে আমরা তৎক্ষণাৎ সশস্ত্র-বাহিনী দ্বারা ঐ বাড়িটি ঘেরোয়া করে ঐ ঘরটির দরজা ভেঙে সেইখানে ঢুকে পড়ি। এইদিন হরিপদ অসুস্থ থাকায় সে আমাদের সঙ্গে আসতে পারেনি। তবে খেঁদাকে চেনে এমন একজন গোয়েন্দা আমাদের সেখানে এনেছিল। ঘরে ঢুকেই আমরা জনৈক ব্যক্তিকে সেখানে একটি খাটিয়ার উপর শুয়ে থাকতে দেখতে পাই। তাকে দেখামাত্র আমাদের সেই গোয়েন্দা দুই পা' পিছিয়ে এসে চীৎকার করে বলে উঠে, 'হুজুর! খেঁদাবাবু ঐ—।' আমরা তৎক্ষণাৎ সকলে মিলে গুলিভরা পিস্তল উঁচিয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমরা আশঙ্কা করেছিলাম যে, তখুনি একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এবং আমাদের দলের অন্তত দুই একজন

সেই যুদ্ধে প্রাণ হারাবে। খোকাবাবুকে বিনা যুদ্ধে একজন শান্ত-শিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় ধরা দিতে দেখে আমাদের সন্দেহ হলো হয়তো আদপেই সে খেঁদাবাবু নয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গের একজন অফিসার, দুইজন সিপাহী ও আমাদের সেই গোয়েন্দা নিঃসন্দেহ রূপেই তাকে খেঁদাবাবু বলেই সনাক্ত করলো। খোকাবাবুর ফটো-চিত্র সম্বলিত একটি পুলিশ গেজেটও আমরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। এই গেজেটে প্রকাশিত খেঁদাবাবুর সম্মুখের ও পার্শ্বদেশের ফটো-চিত্রের সহিত আমাদের এই ধৃতিকৃত আসামীর সম্মুখের ও পার্শ্বের চেহারায় হুবহু মিলও আমরা দেখতে পেলাম। এই গেজেটে খোকার বাম হাতে উল্কির দ্বারা একটি নারিকেল গাছে জড়ান একটি সাপ এবং তার ডান হাতে একটি গোলাপ ফুল ও তার নিম্নে 'প্রাণের খেঁদা'—এই কথাকয়টি উৎকীর্ণ আছে বলে লেখা আছে। এ'ছাড়া ঐ গেজেটের পাতায় খোকার বাম দিককার কপালের ভ্রূর নিকট একটি কাটা দাগ ও তার নিম্নের ঠোঁটটি কাটা ও সেলাই করা আছে বলে লেখা আছে। শুধু তাই নয়, ঐ গেজেটে তার গাত্রবর্ণ ও উচ্চতার মাপ ও অন্যান্য বিবরণের সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করা ছিল। আমরা পুলিশ গেজেটে উল্লিখিত ঐ সকল বিবরণের সঙ্গে ধৃতিকৃত আসামীর দেহের আকৃতি ও অন্যান্য চিহ্নের সহিত তুলনা করে দেখলাম যে, উভয়ের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত প্রতিটি বিষয়ে হুবহু মিল আছে। কিন্তু এতো সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না যে, খেঁদাবাবুকে এতো সহজে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হতে পারে। নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করে আমরা অকুস্থলে নিজেদের মোতায়েন রেখে কয়েকজন সিপাহীসহ আমাদের ট্রাকটিকে খোকার বাল্যকালের বন্ধুদ্বয় দেবেন ও হরিপদকে আনবার জন্য কোলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম। দেবেনবাবু বাড়িতে উপস্থিত না থাকায় আমাদের লোকজনেরা কেবলমাত্র কলিকাতা

থেকে হরিপদবাবুকে নিয়ে, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমাদের কাছে তাঁকে পৌঁছিয়ে দিলে। অতর্কিতে ধৃতিকৃত আসামীকে সেখানে দেখে হরিপদবাবুও ক্ষণিকের জন্য সভয়ে দুই পা পিছিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু পরে তার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর হরিপদবাবু নিশ্চিন্তমনে আসামীর দিকে এগিয়ে এসে আমাদের জানালেন যে, ধৃতিকৃত ব্যক্তি আদপেই সেই খোকা ওরফে খাঁদাবাবু নয়। তবে সে খোকাবাবুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তার একজন দলের লোকও বটে। এই সম্পর্কে হরিপদ আমাদের কাছে ঐ দিন যে উল্লেখযোগ্য বিবৃতিটি দিয়েছিল তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"দেবেন, খোকা, কেষ্ট ও গোপী—এই কয়জনের সঙ্গে এককালে একটি স্থানীয় হাইস্কুলে কিছুকাল পড়েছিলাম। খোকাই সাধারণত ক্লাশের মধ্যে পড়াশুনা ও খেলাধূলায় ফার্স্ট বয় বলে প্রখ্যাত ছিল। কিন্তু পরে বাধ্য হয়ে সে ঐ স্কুল ছেড়ে চলে আসে এবং ঐ স্কুলের ছাত্র কেষ্ট ও গোপীকে দলে ভিড়িয়ে একটা ডাকাত দলের সৃষ্টি করে। প্রথমে তারা দেশ উদ্ধারের জন্য একটি মুক্তি-সেনা সৃষ্টি করার জন্য এই দলটির সূচনা করে। কিন্তু উহাতে পরে বহু পুরান পাপীকে ভর্তি করার ফলে ধীরে ধীরে উহা একটি সাধারণ ডাকাত দলে পরিণত হয়ে পড়ে। এরা এই খুনটি ছাড়া আরও বিশ-ত্রিশটি খুন করেছে বলে আমার শুনা আছে। তবে পাগলা ও শিউচরণ হত্যার জন্যে যে একমাত্র এরাই দায়ী তা আমি হলপ করে বলতে পারি। এরা আমাকে ও দেবেনকে দলে ভর্তি করবার জন্য বহুবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের ঐ সকল অপকার্যে যোগ দিতে আমরা রাজি হইনি। তবে বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনরা তাদের অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধারের জন্য আমাদের কাছে কেঁদে পড়লে এদের সাহায্যে আমরা কয়েকবারই তাদের চুরি-যাওয়া ও হারানো দ্রব্যাদি উদ্ধার করে দিতে সমর্থ হয়ে-

ছিলাম। এক বৎসর পূর্বে কুমারটুলির বিখ্যাত জমিদার অমুক বাবুর বাড়ি থেকে একটি টোটা ভরা রিভলভার সমেত ৫০ হাজার টাকা মূলের গহনা যে এরাই তালা ভেঙ্গে চুরি করেছিল তা আমার অজানা ছিল না। তবে এই সম্বন্ধে আমি থানায় কোনও সংবাদ দিলে আমাকে তার পরদিনই আপনাদের ইনফরমার শিউচরণিযার মত ইহসংসার পরিত্যাগ করে চলে যেতে হতো। আমি এও জানি যে এদের দলে ৭০ বা ৮০ জন লোক সংযুক্ত আছে এবং এরা একাধারে ডাকাতি, খুন ও বার্গলারি বেঙ্গল, বিহার, উড়িষ্যা ও ঐ তিনটি প্রদেশের রেলওয়ে সমূহে সমাধা করে থাকে। এদের অপকার্যে কাহারও সামান্য মাত্রও প্রতিবন্ধক হওয়াব সম্ভাবনা থাকলে এরা নির্বিচাবে তাকে ছলে বলে হত্যা করে এই মরজগৎ থেকে সরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠে। আমাব সঙ্গে খোকাবাবুর পৃথিবীর এই শহবের ওপরতলা ও নিচের তলা—এই উভয় পরিবেশেই বহুবার দেখা হযেছে। কিন্তু এই কথা আমি আমার বাল্য বন্ধু এক দেবেন ছাড়া আর কাউকেই কোনও দিন প্রকাশ করতে সাহসী হই নি। কয়েকমাস সে সমাজের ওপর তলায় বাস করে পুনরায় সে কয়েক মাসের জন্য উহার নিচের তলায় ফিরে গিয়েছে। যখন সে সমাজের ওপর তলায় খুশমেজাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন আপনারা বৃথাই তাকে সমাজের নিম্নতম স্থানে খুঁজে বেড়িয়েছেন।"

এরপর আমি হরিপদবাবুকে কয়েকটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য তাঁর কাছ হতে জেনে নিই। নিম্নে প্রশ্নোত্তর হতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বুঝা যাবে।

প্রঃ—আপান সমাজের উপরতলা ও নিচের তলা বলতে কি বুঝাতে চান? খোকাবাবুর একারই কি সমাজের এই উভয় স্তরে আনাগোনা আছে?

উঃ—খোকাবাবু মধ্যে মধ্যে 'তার দলের ভার গোপী বা কেষ্টবাবুকে দিয়ে সকলের অজ্ঞাতে কিছুকালের জন্য কোথায় উধাও হয়ে যায়। এই সময় পুলিশের ন্যায় তার দলের লোকেরাও তার কোন হদিশই পায় নি। এই সময় সে শহরের উন্নত অংশে ফ্ল্যাট ভাড়া করে সেখানকার ভালো ভালো লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। এমন কি, সে এই সময় বিলাতি স্যুট পরে গণ্যমান্য লোকের ক্লাব ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মেম্বার হয়ে বিবিধ পার্টি ও মিটিংএ যোগদান করেছে এবং ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি ক্রীড়া ও অন্যান্য সভ্যজন-সুলভ আমোদ-প্রমোদেও নিরপরাধ মানুষের ন্যায় যোগদান করেছে। এমন কি নীলা নামে এক বিদূষী ধনিকন্যা এবং মিসেস সেন নামে জনৈক ব্যারিস্টার-পত্নীর সহিত সে কিছুকাল মেলামেশাও করেছিল। এর কয়েকমাস পরে হঠাৎ সে একদিন পুনরায় লুঙ্গি ও ছেঁড়া গেঞ্জি পরে শহরের পঙ্কিল বস্তির মধ্যে অবস্থিত তাদের ডেরাতে ফিরে এসে তার প্রেমাকাঙ্ক্ষী বেশ্যানারী এবং সাথী চোর-ডাকাতদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আমার মনে হয়, আপনারা তাকে কোনও মামলার ব্যাপারে বেশি খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করলে সে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে কিছুকালের জন্য এইভাবে সমাজের ওপরতলায় এসে গা ঢাকা দিত। এই অবস্থায় তাকে কেউ দেখলে তাকে চিনেও চিনতে না পারবারই কথা।

প্রঃ—হুঁ, বুঝলাম। খুব সম্ভবত তার মধ্যে অবস্থিত দ্বৈত ব্যক্তিত্বের জন্যই সে প্রয়োজন মত এইভাবে ভোল বদলাতে সক্ষম ছিল। কিন্তু এই ধৃতিকৃত আসামী সুধীরকে সে পেলো কোথায়? তুমি কি ইতিপূর্বে কখনও এই আসামীটিকে কোথায়ও দেখেছিলে?

উঃ—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার! ওকে মাত্র একদিন আমি খোকাবাবুর

সঙ্গে ব্ল্যাক স্কোয়ারে দেখেছিলাম। দু'জনকে একত্রে দেখে সত্য সত্যই সেইদিন আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা জানি যে, কখনও কখনও দুইজন মানুষের মুখ ও দেহের মধ্যে একপ্রকার আদল দেখা যায়। কিন্তু এদের মত হুবহু এক রকমের চেহারার মানুষ ইতিপূর্বে আমি দেখি নি। পরে আমি খোকার মুখে শুনেছিলাম যে, তার মত একই রকম চেহারার এই মানুষটির সন্ধান পেয়ে তাকে বহু চেষ্টায় সে তার ঐ অপদলের মধ্যে ভর্তি করে নেয়। তাদের দলের জন্য একজন ডুপ্লিকেট খোকা তৈরি করে তাকে কয়েকটি কাজে লাগাবার জন্য সে এইরূপ কার্য করেছিল। পূর্বে সুধীরবাবুর দেহে খোকার দেহের অনুরূপ ঐরূপ কাটাকুটি ও উল্কি চিহ্নাদি ছিল না। পরে খোকাবাবুর নির্দেশে সুধীরবাবু ঐগুলি নিজ দেহে ধারণ করেছিল। এমন কি সে ধরা পড়ে জেলে গেলে সে থানায় খোকার নাম লিখিয়েই জেলে গিয়েছে। আপনাদের এই পুলিশ গেজেটে যে খোকার প্রতিকৃতি দেখেছেন, আসলে ওটা এই সুধীরবাবুরই প্রতিকৃতি। এই জন্য সুধীর জেলে থাকলে আপনারা মেনে নিয়েছেন যে খোকাই জেলে আছে। এই জন্য এই সময়ের মধ্যে সমাধিত কোনও অপকার্যের জন্য স্বভাবতই আপনারা খোকাবাবুকে দায়ী করতে পারেন নি। তা'ছাড়া অয়েল পেন্টিং-এর ন্যায় ফটোচিত্রে মানুষের প্রকৃতি ও চরিত্র পুরাপুরি প্রস্ফুটিত করা যায় না। এইজন্য দুইটি মানুষের ফটো বহু ক্ষেত্রে একটি মানুষের মত অবিশেষজ্ঞদের কাছে প্রতীত হয়ে থাকে। আমি এই সকল সংবাদ আপনাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে প্রাইভেট গোয়েন্দারূপে অতি কষ্টে সংগ্রহ করেছি।

আমরা সকলে হরিপদবাবুর এই বিবৃতি শুনে সত্য সত্যই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলাম। ধৃতিকৃত আসামী সুধীরকে থানায় এনে ইন্সপেকটার সুনীলবাবুর কাছে তাকে পেশ করে আদ্যোপান্ত ঘটনাটি তাঁর

নিকট বিবৃত করলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'হুম্! তাহলে একে এখুনিই হাকিমের কাছে পেশ করে নির্দোষ বলে তাকে বেকসুর খালাস করে দেবার জন্ত সুপারিশ করা দরকার।' সুনীলবাবুর এইরূপ অভিমতে একটু বিরক্ত হয়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'সে কি স্তার। এতো কষ্ট করে এই লোকটাকে আমরা ধরে আনলাম। খুনের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত হলেও লোকটা এদের এই গ্যাঙ্গের একজন মেম্বার। তা ছাড়া এ একটা ইন্টারেসটিং ফিগার তো বটে।' অভিজ্ঞ ইন্সপেকটার সুনীল রায় খেঁকরে উঠে আমার এই উক্তির উত্তরে বললেন, 'কিন্তু একে মামলায় জড়িয়ে রাখলে তুমি মূল আসামী খোকাকে কিছুতেই বিচারে সাজা দেওয়াতে পারবে না। এই মামলার বিচারের সময় জুরিদের মনে সন্দেহ জাগবে যে, এই নিরীহ সুধীর না এই দুর্দান্ত খোকাবাবুই এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল হত্যাকারী! এই অবস্থায় দোদুল্যমান চিত্তে তাঁরা খোকাবাবুকে সন্দেহের অবকাশ বা বেনিফিট অফ ডাউট্ দিয়ে খালাস দিয়ে দিতে পারেন। এইরূপ একটা বিচার-প্রহসনের ঝোক্কি আমি নিতে আদপেই রাজি নয়। এ পাপ বাপু এখুনি আমাদের এই মামলার হুদো থেকে তুমি বিদেয় করে দাও।' এরপর আমরা সকলে ইন্সপেকটার সুনীল রায়ের এই যুক্তির তারিফ না করে থাকতে পারি নি। এইজন্ত এই মামলার জন্য অকারণে কোনও জটিলতা সৃষ্টি না করে আমরা সুনীলবাবুর উপদেশ শিরোধার্য করে এই মামলার সহিত সম্পর্ক রহিত আসামী সুধীরবাবুকে তখুনি জামিনে মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। এরপর স্বভাবতই আমরা খোকাবাবুর পিছনে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। অপর-দিকে খোকাবাবুও এদিকে আমাদের এই প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করতে বদ্ধপরিকর। যে স্থানটিতে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড সমাধা হয়েছিল সেই স্থানে প্রতিটি রাত্রে সে বারে বারে ফিরে এসেছে। বৈজ্ঞানিকরা

বলে থাকেন যে, মানুষের শোণিতস্পৃহা অপরাধস্পৃহার ন্যায় একটি আদিম স্পৃহা। একদিন আদিম মানুষ তাদের পূর্বপুরুষ হিংস্র জীবদের ন্যায় রক্তপানে অভ্যস্ত ছিল। সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে কাল-ক্রমে ধীরে ধীরে আমরা আমাদের সেই আদিমতম অভ্যাস পরিত্যাগ করেছি! কিন্তু তা সত্ত্বেও তা আমাদের মনের অন্তর্দেশে বিভিন্ন মাত্রায় নিহিত আছে। অভ্যাস দ্বারা একবার উহা অতিমাত্রায় নির্গত হয়ে এলে উহাকে সহজে নিবৃত্ত করা যায় না। সময় বিশেষে এই রক্ত-পানের নেশা রক্ত দর্শনের নেশাতেও রূপান্তরিত হতে দেখা গিয়েছে। এইজন্যই খুনের পর খোকাবাবুর মধ্যে উদ্‌গত এই উগ্র শোণিত-স্পৃহাই বোধহয় তাকে বারে বারে হত্যাস্থলটি দেখে আসতে বাধ্য করছিল।

খোকাবাবুকে যখনই কেউ রাত্রে কুমারটুলি অঞ্চলে দেখতে পেয়েছে, তখনই ভীত পথচারীরা ও নিরীহ দোকানদাররা চারিদিকে ছুটাছুটি করেছে। পুলিশও তার আগমন সম্পর্কে খবরাখবর পাবামাত্র অকু-স্থলে ছুটে গিয়েছে, কিন্তু সেই হত্যাস্থল সহ আশে-পাশের বস্তিঅঞ্চল ও অলিগলি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তার কোনও হদিসই তারা পেতে পারেনি। শেষের দিকে ঐ অঞ্চলের সাধারণ নাগরিকগণ খোকা-বাবুকে এক অশরীরী জীব মনে করে তার অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের নিকট কোনও সংবাদই আর পৌঁছে দিত না। এইসব কারণে আমরাও বহুদিন রাত্রিকালে ঐ এলাকায় আর রাউণ্ড দেবার জন্য বহির্গত হইনি। শেষে এইরূপ সরগরম ভাবটি কথঞ্চিৎ কমে এলে এক রাত্রে রাউণ্ডে বেরবার জন্য দরওয়াজার সিপাহীকে একটা রিক্সা ডাকতে বলে আমি অফিসে বসে তৈরি হচ্ছিলাম। সিপাহী ভাইটি আমার জন্য রিক্সাটি আনার পর আমি সেইদিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এমন সময় আমাদের প্রতিবেশী ব্যাঙ্কশাল কোর্টের এক

উকিল গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বার্গলারি মামলার আসামীর জামিনের জন্য আবেদন করতে এলেন। এই মামলাটি জামিন-গ্রাহ্য না থাকায় আমি কিছুতেই উহার আসামীকে জামিন দিতে চাইলাম না। তাঁর সহিত এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে আমার রাত্রিকালীন রাউণ্ডের সময় এক ঘটিকা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এরপর বিরক্ত হয়ে আমি আমার নিজের চেম্বারে এসে বসলাম এবং উকিলবাবু গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাগে গজগজ করতে করতে থানা হতে বার হয়ে আমারই জন্য আনা রিক্সাটিতে চেপে বসলেন। এর দশ মিনিট পরে আমাদের ঐ প্রতিবেশী উকিলবাবু হন্তদন্ত হয়ে থানায় এসে একটি অদ্ভুত এবং ভীতিপ্রদ বিবৃতি প্রদান করলেন। তাঁর অত্যদ্ভুত বিবৃতিটি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"আপনি আজ বড্ড বেঁচে গেছেন পঞ্চাননবাবু! আপনাকে আমি সাবধান করে দেবার জন্য থানায় ছুটে এসেছি। আজ রাত্রে রাউণ্ডে বেরুলে আপনার মৃত্যু ছিল সুনিশ্চিত। আমি রিক্সাটায় চড়ে বসা মাত্র রিক্সাপুলার মাথা নাড়তে নাড়তে দ্রুতগতিতে শ্যামবাজারের রাস্তা ধরে চলতে শুরু করলো। এমনি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আমি তাকে আমাদের বাড়ির দিককার রাস্তার দিকে বেঁকতে বলা মাত্র সে অবাক হ'য়ে এই সর্বপ্রথম আমার দিকে চেয়ে দেখলো। এরপর সে আমাকে আমাদের বাড়িতে পৌঁছে দেবার পর রিক্সা থেকে নেমে আমি তাকে ভাড়ার পয়সা মিটাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে পয়সা না নিয়ে খাড়া হয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠলো, 'আমাকে চিনতে পারছেন গোপালবাবু! আমার দিকে চেয়ে দেখুন, আমিই হচ্ছি খেঁদা! পঞ্চাননবাবুকে বলবেন যে, তাঁর বদলে আপনি রিক্সায় উঠেছিলেন বলে ভগবানের দয়ায় আজ তিনি বেঁচে গেলেন। তবে তাঁকে আপনি একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন যে, তাঁর জীবনের মেয়াদ এইবার ফুরিয়ে এসেছে।"

এর পর দিন আমরা আমাদের গুপ্তচরদের মুখে সংবাদ পেলাম যে, খোকাবাবু আমাদের থানার উপরকার কোআর্টারের দেওয়ালের খড়া বেয়ে উঠে জানালার মধ্য দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে আমাদের হত্যা করবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। এই সংবাদ ইন্‌স্পেক্টার সুনীলবাবু কলিকাতা পুলিশের ভত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনার শ্রীনর্টন জোন্‌স্‌কে জানালে তিনি আমাদের কোআর্টারের জানালাগুলি ওঅ্যার-নেট বা তারের জাল দ্বারা আবৃত করে দেবার ব্যবস্থা করবার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। এর পর হতে খোকাবাবুকে জীবিত বা মৃত ধরে আনবার জন্য আমরাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করে এক রকম মরিয়া হয়েই কাজে লেগেছিলাম। এর কারণ এই যে, আমরা জানতাম, পিছিয়ে আসবার আর আমাদের উপায় নেই। এবং আমরা যদি তাকে মারতে না পারি তো সেই আমাদের এক সময় না এক সময় মেরে দেবে। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, তাকে জীবিত ধরবার চেষ্টা না করে তাকে দেখা মাত্র গুলি করে মেরে ফেলাই শ্রেয় হবে। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনি। আমাদের মতে এইরূপ কার্য হত্যাকাণ্ডেরই সামিল। তবে তাকে খুঁজতে বেরুবার সময় আমরা আমাদের জামার তলায় লৌহবর্ম পরিধান করতাম। কোনও বাটী তল্লাসের সময় মাথায় লৌহ শিরস্ত্রাণ পরে ডান হাতে আবক্ষ-পরিমাণ লৌহশিল্ড এবং বাম হাতে টোটা-ভরা পিস্তল সহ আমরা অগ্রসর হতাম। এই সকল সাজসরঞ্জাম ইংরাজ আমলে সশস্ত্র বিপ্লবীদের আবাস রেইড্ করবার জন্য পুলিশ হেড-কোআর্টারে মজুত রাখা হতো। এই মামলার জন্য বিশেষ হুকুম নিয়ে এইগুলি আমরা লালবাজার থেকে আনিয়ে নিয়েছিলাম।

এমনি ভাবে আরও পক্ষাধিক কাল অতিবাহিত হয়ে গেল। কিন্তু এই মামলার অন্যতম আসামী খোকা ও কেষ্টকে আমরা বৃথাই সন্ধান

করে চলেছি। আমাদের সকল আততায়ীকে আমরা চিনি না, কিন্তু আমাদের প্রতিটি আততায়ীই আমাদের চেনে। একবার তাদের কেউ অতর্কিতে আমাদের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরার পর আমাদের পকেট থেকে আমাদের পিস্তল বার করা বা না করা সমান কথা। সত্য কথা বলতে কি, আমরা আমাদের জীবন খরচের খাতাতেই লিখিয়ে দিয়েছিলাম। তবে সর্বক্ষণই আমাদের মনোবল আমরা অটুট রেখেছিলাম। একদিন রাত্রি এগারোটার সময় থানায় খবর এলো যে, খোকাবাবু চিৎপুর রোডের একটি বেশ্যাবাড়ির ত্রিতলের একটি কক্ষে অধিবেশিত একটি গানের জলসায় তার দলের লোকদের দ্বারা সংবর্ধিত হচ্ছে। এইরূপ গোলমালের মধ্যে খোকাবাবুর পক্ষে নিশ্চিন্ত মনে থানার এতো নিকটের এক স্থানে গানের মজলিসে যোগদানের কথা শুনে আমরা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমরা কালবিলম্ব না করে সেইখানে সশস্ত্র অভিযানের ব্যবস্থাও করেছিলাম। ঐ বেশ্যা বাড়ির ত্রিতলে এসে আমরা দেখলাম, যে, ঐ ঘরটি ভিতর হতে অর্গল-বদ্ধ থাকলেও তার ভিতর হতে ঘুঙুরের শব্দ ও গানের আওয়াজ আসছে। আমরা আর কালবিলম্ব না করে সকলে মিলে সবুট পদাঘাতে দরজাটি ভেঙে ফেললাম। এর পর হুড়মুড় করে গুলিভরা পিস্তল হাতে ঐ ঘরে ঢুকে পড়া মাত্র দেখলাম যে, এক ব্যক্তি ঐ ঘরের রাস্তার দিককার খোলা জানালা গলে বাইরে লাফিয়ে পড়লো। আমাদের অধুনাতন এবং খোকাবাবুর পূর্বতন বন্ধু হরিপদ সরকার অন্যদিনের ন্যায় এই দিনও আমাদের সঙ্গে ছিল। সে তাকে দেখে তারস্বরে চীৎকার করে বলে উঠলো, 'স্যার ওই যে খেঁদা—এখুনি ওকে গুলি করুন।' কিন্তু আমাদের কোনও প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করার পূর্বেই সে জানালা গলে বাই লাফিয়ে পড়েছে। আমাদের সকলেরই ধারণা হয়েছিল যে, খেঁদাবাবু

অতো উঁচু হতে লাফিয়ে নিচে ফুটপাতে পড়ে এতক্ষণে তার ইহলীলা শেষ করে সে তার এ মরজীবনের অবসান ঘটিয়েছে। এইজন্য উপরে আর একটুও অপেক্ষা না করে আমরা তড়্ তড়্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাস্তায় এসে দেখলাম যে, খোকা ওরফে খেঁদাবাবুর লাস সেখানে পড়ে নেই। সামনেই একটি পানের দোকান অত রাত্রেও সেখানে নিয়মমত খোলা ছিল। পানওয়ালাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য এগিয়ে গিয়ে আমরা দেখলাম যে, তার গাল দুটো টকটকে লাল ও তার ওই গাল দুটোর উপর পাঁচ আঙুলের ছাপ। পানওয়ালা হাপুস নয়নে কাঁদছিল ও সেই সঙ্গে সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলও। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে নিম্নোক্তরূপ একটি বিবৃতি দিয়েছিল। তার সেই বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য বিধায় তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"আমি এই সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটি খরিদ্দারের সঙ্গে কথা কইছিলাম। হঠাৎ একটা সর্-সর্ আওয়াজ শুনে উপরে তাকিয়ে দেখি, ডিগবাজি খেতে খেতে একটা লোক নিচের দিকে পড়ছে। সে আমার দোকানের ঝাঁপের উপর ঠক্কর খেয়ে নিচের ফুটপাতের উপর আছড়ে পড়লো। আমাদের মনে হলো যে তার হাত-পাগুলো তার পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেলো। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের হাত দিয়েই নিজের হাত-পাগুলো টেনে টেনে সোজা করলো! এরপর সে আমার সম্মুখে এসে আমার বাম গালে সজোরে একটা চড় কসিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, দে বেটা একটা সিগারেট। আমি তার ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট তার মুখে তুলে দিলাম। এর পর সে আমার ডান গালে আর একটা চড় কসিয়ে দিয়ে বলে উঠলো,—এই, দে বেটা এখুনি এটা ধরিয়ে। আমি তাকে খেঁদাবাবু বলে চিনতে পেরেছিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি সভয়ে দেশালাইয়ের কাঠি জ্বেলে তার সিগারেটটা ধরিয়ে দেওয়া মাত্র সে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখা আমার

সাইকেলটা টেনে নিয়ে সেটাতে চড়ে বসে শিস্ দিতে দিতে পাশের গলিটার মধ্যে অগ্রসর হয়ে গেল।”

আমরা কেহই পানওয়ালার এই বিবৃতিটির সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসী হতে পারলাম না। বেশ্যাপাড়ার পানওয়ালারা মদ বেচে ও পুরানো পাপী ও বেশ্যাদের সঙ্গে সংযোগিতা করে। প্রায়শ ক্ষেত্রে তারা সহজে কখনও সত্য কথা বলেনি। ইন্‌স্পেক্টার সুনীলবাবু অভিমত প্রকাশ করলেন যে, খেঁদা নিশ্চয়ই দেওয়ালের খড়া বা পাইপ ব'য়ে নিচে নেমে এসেছে। খোকা তাকে বোধহয় সতর্কিত করবার জন্যে তাকে মারধর করে গিয়েছে। এই জন্যে পানওয়ালা ভয়ে সত্য কথা গোপন করে মিথ্যার অবতারণা করে'ছ। আমাদের মধ্যে একজন অফিসার তাকে খোকারই জনৈক দলের লোক ব'লেও সন্দেহ করে তাকে গ্রেপ্তারের প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু পানওয়ালার পালানোর সম্ভাবনা না থাকায় তখনকার মত তাকে রেহাই দিয়ে আমরা খোকাবাবুর আশু গ্রেপ্তারের জন্য ঐ স্থানটি ঘেরাও করে সেখানকার প্রতিটি গৃহ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখাই সমীচীন মনে করলাম। কিন্তু ভোর রাত্রি পর্যন্ত ইতস্তত ছুটাছুটি ও ঐ বেশ্যা-পল্লীর বাড়ি বাড়ি হানা দিয়েও সেইদিন কোথাও তাকে আমরা খুঁজে বার করতে পারিনি।

আসামী সুধীর এই মামলার সহিত সম্পর্ক-রহিত থাকলেও আমাদের এই মামলার দায় হতে মুক্ত হওয়ার পূর্বে সে আমাদের একটি প্রয়োজনীয় সংবাদ দিয়ে গিয়েছিল। সে আমাদের জানালো যে, এই সময় খোকাবাবু আত্মগোপনের জন্য শান্তিনিকেতনের বিদেশীদের জন্য নির্দিষ্ট অতিথিভবনে বসবাস করছে। আমরা এই সংবাদটিকে অবিশ্বাস্য মনে করলেও খোকার পূর্বতন বন্ধু হরিপদ উহা অবিশ্বাস্য মনে করে নি। পুলিশ-বিভাগে এমন বহু ব্যক্তি আছে যারা প্রতিটি সংবাদ বিশ্বাস ক'রে পরে তদন্ত করে দেখে যে উহা সত্য সত্যই

বিশ্বাস্য কি না, আবার সেখানে এমন লোকও আছে যারা কোনও এক সংবাদ পাওয়ার পর উহা অবিশ্বাস্য মনে করে তদন্ত করে দেখে যে উহা সত্যসত্যই অবিশ্বাস্য কি না। আমরা ছিলাম শেষোক্ত শ্রেণীর অফিসার। তাই আমরা স্থির করলাম যে, হরিপদবাবুকে নিয়ে একবার শান্তিনিকেতনে ঘুরে এলে হয়। পরিশেষে এই দুরূহ কার্যের ভারও আমাকেই নিজের স্কন্ধে তুলে নিতে হয়েছিল। এদিকে কর্তৃপক্ষ আমাদের নির্দেশ দিয়ে বসলেন যে, খোকাবাবুকে সেখানে পেলেও তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ যেন করা না হয়। কর্তৃপক্ষ আমাদের সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিলেন যে, আমরা যেন আশ্রম থেকে তাকে ফলো করে এসে তাকে ঐ আশ্রম বা বিদ্যায়তনের বাইরে এসে ধরি। ঐ আশ্রম বা বিদ্যায়তনের মধ্যে খোকাবাবুর সহিত গুলি-বিনিময় করা আমাদেরও মনঃপূত ছিল না। উপরন্তু বিশ্বকবি এই সময় ঐ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। আমি ও হরিপদবাবু একদিন সন্ধ্যায় এসে এই আশ্রমের ভারতীয় অতিথিভবনে আশ্রয় গ্রহণ করলাম। বলা বাহুল্য, ছদ্মবেশে আমরা সেখানে এসে আমাদের পর্যটক বলে সেখানে সকলের নিকট পরিচয় প্রদান করি। এর পরদিন খোকাবাবুকে চকিতের জন্য আমরা দূর হতে উত্তরায়ণের নিকট রাস্তার উপরে একবার মাত্র দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। কিন্তু দ্রুতগতিতে আমরা সেখানে এসে পৌঁছিবার পূর্বেই সে অন্তর্ধান হয়ে যায়। আমরা শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বোলপুর স্টেশনের নিকট বহুবার ঘোরা ফেরা করেও তার আর কোনও সন্ধানই পাই না। অগত্যা আমাদের কোল-কাতাতেই আবার ফিরে আসতে হয়। কোলকাতা শহরে তদন্ত দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, খোকাবাবু কোলকাতায় ফিরে নি। কিন্তু তা'হলেও আমরা একটি দিনের জন্যও নিশ্চেষ্ট হয়ে

বসে থাকি নি। বরং আমরা প্রতিটি রাত্রে সন্দেহমান প্রতিটি স্থানে একবার করে খোকাবাবু ও তার বন্ধু কেষ্টবাবুর সন্ধানে হানা দিয়ে চলছিলাম।

এই ভাবে দিনের পর দিন ব্যর্থ অভিযান চালানোর পর অবশেষে ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৭৬) তারিখে আমাদের ভাগ্য কথঞ্চিৎ সুপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। এতোদিন মলিনাকে আমরা সশস্ত্র শান্ত্রী-দ্বারা সুরক্ষিত করে রেখেছিলাম। এই জন্যই বোধ হয় কেষ্ট বা খোকা এতোদিন সেখানে হানা দিতে সাহসী হয় নি। কিন্তু মাত্র তিন দিন পূর্বে আমরা ইচ্ছা করেই খোকার প্রেয়সী মলিনার বাটী হতে আমাদের মোতায়েন সশস্ত্র শান্ত্রী উঠিয়ে দিয়ে সেখানে মাত্র সাদা পোশাক-পরা সিপাহী মোতায়েন করে দিই। কিন্তু আমাদের চালাকি না বুঝতে পেরে এইদিন খোকার নির্দেশে কেষ্ট মলিনার বাড়ির অবস্থা সম্বন্ধে গোপনে খবর নিতে এসে সত্য সত্যই আমাদের গোয়েন্দা পুলিশের হাতে অতর্কিতে ধরা পড়ে গেল। সত্য সত্যই এই দিনকার এই সাফল্যের কারণে আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না।

কেষ্টকে থানায় এনে আমাদের নিকট হাজির করা হলে আমি নিবিষ্টমনে এই আসামী কেষ্টকে বুঝতে চেষ্টা করলাম। খোকার মত কেষ্ট কোনও এক স্বভাব বা মধ্যম অপরাধী ছিল না। যতদূর বুঝা গেল, তাকে একজন অভ্যাস অপরাধীই মনে হলো। এক ধার্মিক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেও কুসঙ্গের কারণে ধীরে ধীরে সে একজন অভ্যাসজনিত অপরাধীতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এই জন্য যে রীতিতে একজন স্বভাব বা মধ্যম অপরাধীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, সেই রীতিতে একে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কোনও লাভ হবার কথা নয়। এইজন্য এর সঙ্গে আমি ভিন্নরূপ ব্যবহার করবার প্রয়োজন মনে করেছিলাম।

আমরা সকলেই নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলাম যে, একমাত্র আসামী গোপীবাবু ও কেষ্টবাবু এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের সহিত এই হত্যাকারীদের দলের সর্বময় নেতা খোকাবাবুর বর্তমান সম্ভাব্য বাসস্থান এবং তাহার গতিবিধি ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ আমাদের সরবরাহ করতে সমর্থ। এই মামলার অন্যতম আসামী গোপীবাবু আমাদের তদন্ত সম্পর্কীয় ভুলের জন্য ইতিমধ্যে হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। এক্ষণে আমাদের একমাত্র সম্বল এই আসামী কেষ্টবাবু। এও যদি গোপীবাবুর মত স্বীকারোক্তি না করে জেল-হাজতে চলে যায়, তাহলে তো এই মামলার তদন্তের ব্যাপারে আমরা অগাধ জলে পড়ে যাবো। এই জন্য যেরূপেই হোক এই আসামী কেষ্টবাবুর নিকট হতে একটি স্বীকারোক্তি আদায় করতে আমরা মনস্থ করলাম। এই সময় জনৈক নাগরিক আমাদের থানায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মধ্যযুগীয় কচুয়া-ধোলাই জাতীয় একটি দাওয়াই এই আসামীর জন্য ব্যবস্থা করবার জন্য আমাদের অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমরা সুসভ্য ভারতীয় বিধায় এই ব্যাপারে দৈহিক পীড়নের পক্ষপাতী ছিলাম না। আমি ঐ ভদ্রলোককে এই সময় বুঝিয়ে বলেছিলাম যে, দৈহিক পীড়ন এই ধরনের উৎকট অপরাধীদের উপর কখনও কার্যকরী হয়নি। এই সকল অপরাধীদের মধ্যে শেষের দিকে ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই জন্য এদের মধ্যে কষ্টবোধ, উষ্মাবোধ প্রভৃতি কয়েকটি বোধ কমে গিয়ে থাকে। এর ফলে দৈহিক পীড়ন এদের কষ্ট না দিয়ে আনন্দ দিয়ে থাকে। এইজন্য এই শ্রেণীর আসামীর প্রতি সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহারের প্রয়োজন আছে। এর পর ঐ বাহিরের ভদ্রলোকটিকে বিদায় দিয়ে আমি দরজার সিপাইকে বাজার হতে সের আড়াই রসগোল্লা এবং তার সঙ্গে কয়েকটি লুচি ও কিছু তরকারি কিনে আনতে বললাম। প্রয়োজনীয় রসগোল্লা ও লুচি তরকারি সেখানে আনা

হলে আমি অপর একজন সিপাহীকে হুকুম করলাম, 'আভি লে'আও আসামী কেষ্ট বাবুকো।' এর পর শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় কেষ্টবাবু আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালে আমি আসামী কেষ্টবাবুর হাতের হাত-কড়ির দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গের সিপাহীকে পূর্ব পরিকল্পনা মত মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললাম, 'এ ক্যা কিয়া হ্যায়? হাতকড়ি লাগায়া কাহে? ই মামুলি আসামী নেহি হ্যায়, ভাই, ই আসামী বড়ঘরকা লেড়কা হ্যায়। ই হ্যায় বহুৎ বড়ী খানদানি আদমী, সমঝা হ্যায়?' এতটা মধুর ব্যবহার থানায় এসে পুলিশের নিকট পাবে, তা খুনী আসামী কেষ্টবাবুর কল্পনার বাইরে ছিল। আমার এইরূপ সদ্ব্যবহারে তার চোখ দুটো সজল হয়ে উঠলো। আমি এইবার বুঝতে পারলাম যে, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত দুর্বল মুহূর্তটি আসামীর মধ্যে এইবার আগতপ্রায়। আমি তাকে সরাসরি খুনের কথা জিজ্ঞেস না করে অতি সহানুভূতির সহিত তার পিতামাতা ও স্ত্রী-পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলাম। এর পর তার সহিত বন্ধুত্বের ভাব দেখিয়ে তাকে ভুলিয়ে ভুলিয়ে রসগোল্লা ও তরকারিসহ কয়েকখানি লুচি খাইয়ে দিলাম। এইভাবে তাকে ভরপেট খাইয়ে দেওয়ার মধ্যে আমাদের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও ছিল। আমরা জানি যে খুব বেশি আহার করলে মস্তিষ্কের রক্ত উদরকে সুপরিচালিত করবার জন্যে উদরে নেমে আসে। এর ফলে রক্তের অভাবে মস্তিষ্কের শক্তি ক্ষীণ হয়ে উঠে এবং তজ্জনিত মানুষের মনের প্রতিরোধ শক্তির হ্রাস ঘটে। এইরূপ অবস্থায় মানুষের মন বিশেষরূপে বাক প্রয়োগশীল হয়ে উঠে। এইরূপ অবস্থায় আসামী তার অন্তরের গোপনতম কথাটিও স্বেচ্ছায় বলে ফেলতে বাধ্য। আমাদের এই উদ্দেশ্যটিকে সাবধানে গোপন করে আমি একজন নিকট আত্মীয়ের মতন কেষ্টবাবুকে বললাম, 'তোমার যদি ইচ্ছে হয় তো পুলিশের নিকট সত্য কথা বলো। কিন্তু যদি তা না ইচ্ছা হয় তো কোনও কথা আমাদের

বলো না।' এরপর আমি নিজেই তাকে হাজতঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে তার শয়নের জন্য দুইখানা ভালো কম্বলও সেখানে আনিয়ে দিলাম। এরপর আমি সহকারীদের যথাযথ উপদেশ দিয়ে রাত্রিকালীন আহার সেরে ঘুমবার জন্য উপরে চলে গেলাম।

এই রাত্রে মাত্র একটুখানি ঘুমিয়ে নিয়ে আমি নিচে নেমে এসে দেখলাম যে, কেষ্টবাবু হাজতঘরে তখনও পর্যন্ত ঘুমাতে পারেনি। আমি সহানুভূতির সহিত কেষ্টবাবুকে হাজত হতে বার করে অফিস ঘরে এনে একটা ভাঙা ডেক্ চেয়ারে শুইয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ ধরে অকারণে ডাইরি লিখলাম। তার পর আমি একটির পর একটি কথা বলে কেষ্টর সঙ্গে আলাপও জুড়ে দিলাম। সাংসারিক কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে আমি এই কেইস সংক্রান্ত দুই-একটা কথা যে না পাড়ছিলাম, তাও নয়। অনেকেই জানেন যে দিনে কেউ ভূত বিশ্বাস না করলেও রাত্রে তারা তা করে থাকে। এর কারণ এই যে রাত্রে স্নায়ু তথা মন দুর্বল থাকে। রাত্রিকালে মানুষের মন অতীব বাক-প্রয়োগশীল বা সাজেস্‌সিভ্ হয়। এই কারণে রাত্রে মানুষকে যা তা বিশ্বাস করানও সম্ভব। বলা বাহুল্য যে আমি এই বিশেষ দুর্বলতারই সুযোগ নিতে চাইছিলাম। এ ছাড়া ডেক-চেয়ারের উপর শোযানোরও একটা কারণ ছিল। মসৃণ আরাম কেদারায় শুলে তার স্নায়ুগুলি এমনিই শিথিল হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থায় মানুষ যুক্তি-তর্ক রহিত হয় এবং সাময়িক ভাবে বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলে। আমি জানতাম যে কখন, কবে এবং কোথায় আঘাত হানতে হবে। এ-কথা ও-কথার পর বাক-প্রয়োগের দ্বারা আমি অচিরেই কেষ্টবাবুকে অভিভূত করে ফেললাম। ইতিমধ্যেই কেষ্টবাবু আমাকে তার একজন আত্মীয়ের মতনই মনে করে আমাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছে। আমরা ঠিক করেছিলাম যে আমরা চারজন অফিসার পালা করে রাত্রে ঘুমিয়ে নেবো এবং তার

পর প্রত্যেকে তিন ঘণ্টা করে সারা রাত তাকে ঘুমুতে না দিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন দ্বারা তাকে জর্জরিত করে তুলবো। পরিশেষে নাচার হয়ে সে যে একটা স্বীকারোক্তি করবে তাতে আমাদের আর কোনও সন্দেহ ছিল না। এইরূপ অবস্থায় পড়লে মানুষ পাগলের মত হয়ে উঠে। এর ফলে প্রশ্নবাণ হতে শুধু অব্যাহতি পাবার জন্যও তারা স্বীকারোক্তি করে ফেলে। য়ুরোপে এইরূপ ব্যবস্থাকেই বলা হয় থার্ড ডিগ্রি মেথড্। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এতো ন্যায়-অন্যায়ের মারপ্যাঁচে পড়ার আমাদের আর কোনও প্রয়োজন হয় নাই। আমার সহিত কথোপকথনের মধ্যে কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে আসামী কেষ্টবাবু তার অনেক গোপন কাহিনীই আমাকে জানিয়ে দিলে। এমন কি, তাদের নেতাজী খোকাবাবুর বর্তমান আবাসস্থলেরও একটা হদিশ সে বিনা দ্বিধায় আমাকে বলে ফেললে। এর পর আমি একটুও কালক্ষেপ না করে নিশ্চিন্ত মনে আসামী কেষ্টবাবুর এই খুন সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতিটুকু দ্রুত-গতিতে টুকে নিয়েছিলাম।

"হঠাৎ সেদিন আমাদের দলের নেতা খাঁদা ওরফে খোকা এসে জানালো, 'জানিস, একটা কাণ্ড হয়ে গিয়েছে'। ছোটখাটো কাণ্ড আমাদের গা'সওয়া। এতে আমাদের আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। তবে ওস্তাদের এরূপ ব্যবহারের কোনওরূপ হদিশ না পেয়ে আমি তাকে শুধালাম, 'কিসের কাণ্ড? কেউ ধরা পড়লো নাকি'? উত্তরে খোকা-বাবু ওরফে খাঁদাবাবু আমাকে জানালো, 'না না, তা নয়। শোন তবে বলি—কাল মলিনার ঘরে আমি বসেছিলাম। এই সময় হঠাৎ আমি দেখলাম যে দরজার বাইরে পুলিশ।' এর পর উদ্‌গ্রীব হয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বলিস কি রে, তারপর?' খাঁদা উত্তরে আমাকে জানালো, 'তারপর! হাঁ, বলছি শোন। মলিনাকে দরজাটা বন্ধ করতে বলে এক লাফে জানালা গ'লে আমি থড়া বয়ে রাস্তায়

নেমে পিছনের সরু গলিটার ভিতর দিয়ে সটকান দিই। আমি চলে আসবার পর মলিনা দরজা খুলে দিলে পুলিশ ভিতরে এসে কাউকে না পেয়ে অপ্রস্তুত হয়ে চলে যায়। কিন্তু এ সবই হচ্ছে ঐ পাগলা বেটার কাণ্ড। সেই আমার সম্বন্ধে পুলিশকে খবর দিয়েছে।' এই পাগলা ছিল, হুজুর, মলিনাসুন্দরীর শিক্ষক, মলিনাকে সে গান শিখিয়েছে। মধ্যে মধ্যে মলিনার ঘরে এসে সে তবলাও বাজাত। বেচারা পাগলা মলিনাকে খুব ভালোবাসতো। যতদূর আমি জানি, মলিনাও অনুরূপ ভাবে তাকে ভালোবাসতো। কিছুদিন আগে হঠাৎ একদিন বে-টাইমে খাঁদা আর আমি মলিনার ঘরে আসি। আমরা পাগলাকে এই সময় মলিনার ঘরে বসে থাকতে দেখে অবাক হই। খাঁদা পাগলার ঘাড় ধরে ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল, 'আমি শা—প্রতি মাসে ৩০০৲ টাকা করে গুনবো, আর তুমি শা—তার ফল ভোগ করবে? বেরো, শা—এখান থেকে।' পাগলা বেরিয়ে যেতে যেতে খোকাকে বলে গিয়েছিল, 'বেটা, খাবিজ গুণ্ডা! কে'না জানে তোকে? দাঁড়া, সব কথা আমি থানায় জানিয়ে দিচ্ছি।' হাঁ হুজুর, এ সত্যি কথা। পরে আমরাও শুনেছি যে পাগলা থানায় খবর দেয় নি। সে সাহসও তার ছিল না। পুলিশ আকস্মিক ভাবে সেদিন মলিনার ঘরে হানা দিয়েছিল। কিন্তু সে যাই হোক, আমাদের হুজুর, ধারণা হয়েছিল যে পাগলাই আপনাদের ঘরে খবর পাঠিয়েছিল। আমরা সকলে পাগলার উপর প্রতিশোধ গ্রহণের মনস্থ করি। আমাদের নেতা খাঁদা ওরফে খোকাবাবুর মতে মলিনার এতে কোনও দোষ ছিল না। এর কারণ এই যে মলিনা সব সময়ই মলিনা! ও-ত জানা কথা। ও-ত বিশ্বাসঘাতকতা করবেই। কিন্তু পাগলা সব বিষয় জেনে শুনে পরের ভাগে ভাগ বসায় কেন? এছাড়া খাঁদার মতে পুলিশে এইজন্য খবর দেওয়াটা ছিল তার পক্ষে এক অমার্জনীয় অপরাধ। পুলিশের দল

হন্যে কুকুরের মত একপাড়া হতে আর এক পাড়ায় তাড়িয়ে নিয়ে আমাদের অতিষ্ঠ করে তুলবে। আমরা না পারবো বাঁচতে, না পারবো জীবনটা ভোগ করতে। এ আমাদের কাছে অসহ্য। সব দিক বিবেচনা করে আমাদের জীবনের পথের কাঁটা এ পাগলাকে আমরা 'ট্যাপ' করাই মনস্থ করলাম।

"১৯৩৮ সালের চৌঠা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমরা দশ জনে মিলে পাগলা ওরফে অতুলকে সোনাগাছির ভিতর পাকড়াও করি। এই সময় সে তার একজন বন্ধুর সঙ্গে পথ চলছিল। খাঁদা পাগলার গলা ধরে ঝাঁকানি দিয়ে হুঙ্কার করে উঠলো, 'জানিস আমি কে? আমি আর কেউ নয়, আমি খোকা। আমি তোর নাক কেটে দেবো।' উত্তরে পাগলা সভয়ে খোকাবাবুকে বললে, 'এবারের মত মাপ কর ভাই। আমি কক্ষনো আর তার ওখানে যাবো না।' ইতিমধ্যে ঐ পাড়ার মাতব্বর মণীন্দ্রবাবু—সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সব কথা শুনে মণীন্দ্রবাবু মধ্যস্থ হয়ে খোকাবাবুকে অনুরোধ করলেন, 'যাক্, এবারকার মত ওকে যেতে দাও।' এর পর পাগলাকে কিছুক্ষণের মত সেখান থেকে আমরা যেতে দিই। কিন্তু সে কিছু দূর চলে আসার পরই আমি খাঁদার আদেশে তাকে পুনরায় চেপে ধরি এবং গোপীবাবু দৌড়ে গিয়ে আমাদের জন্য সেখানে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে পাগলা একবার আমাদের হাত ফস্কে 'নাকি বীণা' নামে একটি স্ত্রীলোকের বাটীতে ঢুকে পড়তে পেরেছিল। কিন্তু আমরা তার পিছু পিছু ধাওয়া করে তাকে পুনরায় পাকড়াও করে নিয়ে এসেছিলাম। ব্যাপার দেখে পাগলার সঙ্গী বন্ধুটি সরে পড়ছিল। গোপীবাবু তাকে চেপে ধরে বলে উঠলো, 'তুই আবার যাচ্ছিস কোথায় রে শা—।' কিন্তু খোকা এই দিনের মত তাকে রেহাই দিতে বলায় সে তাকে ছেড়ে দেয়। এর পর আমরা সকলে মিলে জোর করে পাগলাকে ট্যাক্সিতে তুলি।

আমাদের ট্যাক্সিখানা গরানহাটার' একটি শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে চলছিল। এমন সময় হঠাৎ পাগলা পাড়া মাত করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওগো, তোমরা আমাকে বাঁচাও। এরা আমাকে মেরেই ফেলবে।' পাগলাকে চেঁচাতে শুনে ট্যাক্সি-ড্রাইভার ঐ মন্দিরের সামনেই তার গাড়িখানা রুখে দিল। সত্য গোয়ালা নামে একজন ব্যক্তি ঐ সময় ঐ মন্দিরের পৈঠায় মাথা ঠুকে প্রণাম জানাচ্ছিল, 'ঠাকুর—বাবা তারকনাথ'। হঠাৎ আমাদের ট্যাক্সিখানা থেমে যাওয়ায় ক্যাঁচ করে একটা আওয়াজ হয়। এই আওয়াজ শুনে সত্যবাবু আমাদের দিকে ফিরে দেখে এবং আমাদের সেখানে এই ট্যাক্সির উপর বসে থাকতে দেখে সে ট্যাক্সির কাছে ছুটে আসে। ইতিমধ্যে হারু গোঁসাই নামে এক স্থানীয় ভদ্রলোকও অন্যান্য পথচারীদের সহিত সেখানে এসে ভিড় করে। এই দুই ব্যক্তির সহিত আমাদের পূর্ব হতে পরিচয় ছিল। এদের মধ্যে গোঁসাইজী ট্যাক্সির পাদানির উপর উঠে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, 'এ্যাঁ, ব্যাপার কি? পাগলাবাবু চেঁচায় কেন?' এ পাগলকে ওরা আমাদের তবলচি বলে জানতো। সেই জন্য এরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত থাকলেও আমাদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে কোনওরূপ সন্দেহ করে নি। পাগলা কিন্তু যে কোনও কারণেই হোক এদের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে কোনও কিছু নালিশ জানায় নি। তবে তার দুই চোখ দিয়ে তখন ঠিক বরষার ধারার মত জল গড়িয়ে পড়ছিল। নিঃশব্দে সে ট্যাক্সির উপর বসে রইলো। এই সময় মুখ দিয়ে তার একটা রাও বেরোয় নি। এদের এই প্রশ্নের উত্তর দিল খাঁদা নিজে। একটু হেসে ফেলে তাদের সে জানালো, 'আপনারাও যেমন। মদটা খেয়েছি। একটু নেশাও হয়েছে। এখন আবার যাচ্ছি আর এক জায়গায় খেতে। এই সকলে মিলে একটু ফুর্তি করতে হে হে—।' এর পর কয়েক মিনিটের মধ্যে ট্যাক্সিখানা

আমাদের নির্দেশ মত গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালো। ট্যাক্সিটাকে এখানে বিদেয় দিয়ে আমরা একটু মদ খেলাম। পাগলাকেও এখানে আমরা একটু মদ খাওয়ালাম। শেষ পর্যন্ত পাগলার বোধ হয় ধারণা হয়েছিল যে আমরা তাকে দুই একটা চড়-চাপড় দিয়েই ছেড়ে দেব। এই জন্যই বোধ হয় সে আমাদের প্রতিটি কথাই শুনে চলছিল। এর পর আমরা তাকে নিয়ে ধীরে ধীরে গঙ্গার ধার দিয়ে অগ্রসর হই। রাত তখন আটটা বেজে গিয়েছে। তবে ঐ দিন জোছনার রাত্রি ছিল। ইতিমধ্যে সাঁতরে গঙ্গা পার হয়ে আমাদের এক পরিচিত পুরানো পাপী গৌরীয়া সেখানে এসে উপস্থিত হলো। গৌরীয়া ছিল একজন সাধারণ 'খাউ' অর্থাৎ চোরাই মালের গ্রাহক বা ক্রেতা। বড় গোছের চুরি-চামারি বা খুনখারাপির মধ্যে সে কখনও থাকেনি। এই সকল ব্যাপারকে সে ভয় করেই চলে। তাকে সেখানে দেখে খোকা তাকে বললো, 'একে আমরা এখানে এনেছি ট্যাপ করবো বলে। আসবি তুই আমাদের সঙ্গে?' ট্যাপ করার প্রকৃত অর্থ গৌরী জানতো। সে আমাদের সঙ্গ নিয়েছিল চোরাই মালের আশায়। খুনখারাপিকে সে বিশেষরূপে ভয় করে। আমাদের মুখে এই ট্যাপের কথা শুনে সে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে পড়লো। বিনা অনুমতিতে সরে পড়ায় খাঁদাবাবু গৌরীয়ার উপর ভীষণ চটে গিয়েছিল। একটা খুনের নেশা তখন তাকে পেয়ে বসেছে। ভীষণ-রূপে ক্ষেপে উঠে খাঁদা আমাদের জানালো, আচ্ছা শা—যাক তো এখন। পরে ওকেও দেখে নেবো আমরা।

'এর পর খাঁদা পাগলাকে আদেশ করলো, 'যা নেমে যা গঙ্গায়। শিগ্রি স্নান করে আয়।' আবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় পাগলা গঙ্গায় নেমে চান করে এলো। পাগলা গঙ্গার পাড়ের উপরকার রাস্তায় উঠে এলে খাঁদা তাকে জিজ্ঞেস করলো, 'কি রে গঙ্গাজল পান করেছিস?' খোকার এই

প্রশ্নের উত্তরে পাগলা তাকে জানিয়েছিল, 'না ভাই পান করিনি।' এইবার ধমকে উঠে খাঁদা তাকে আদেশ করলো, 'যা শিগ্রি গঙ্গাজল পান করে আয়।' খাঁদার আদেশে পাগলা পুনরায় গঙ্গার জলে নেমে অঞ্জ'ল ভরে গঙ্গোদক পান করে এলো। আমি শুনেছি যে পাগল ভালোরূপ সাঁতার জানতো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সে এ বারও পালাবার চেষ্টা করে নি। এর পর খাঁদার নির্দেশে আমরা তাকে নিকটের এক 'কালভৈরব' শিবের মন্দিরে নিয়ে আসি। খাঁদা পূর্বের মত আবার তাকে আদেশ জানালো, 'যা বেটা যা, ঠাকুর নমস্কার করে আয়।' মন্দিরের ঠাকুরকে প্রণাম করে ফিরে এলে খাঁদা পাগলাকে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'চরণামৃত একটু খেয়েছিস তো?' তার এই কথার উত্তরে পাগলা তাকে জানালো, 'না ভাই খাইনি তো!' খাঁদা আবার তাকে ধমকে উঠে বললে, 'এ্যাঁ? খাস নি? যাঃ শিগ্রি খেয়ে আয়।' আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাগলা মন্দিরের পুরোহিতকে বা সেখানকার অপর কাউকে তার এই আশু বিপদের সম্বন্ধে কোনও নালিশ জানায় নি। এমন কি মন্দিরের দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষার চেষ্টাও সে করে নি। ঠাকুরের চরণামৃত পান করে সুবোধ বালকের মতই সে আমাদের নিকট ফিরে এসেছিল। এর পর আমরা পাগলাকে কুমারটুলির একটা স্যুআর্ড ডিচ বা মেথর গলির মধ্যে টেনে আনি। গলিটা ছিল একটি অপরিসর গলির পথ। একমাত্র মেথররাই সেই পথে যাতায়াত করে। চারি দিক অন্ধকার—নিঃশব্দ অন্ধকার। হঠাৎ খাঁদা আস্তিনার তলা থেকে হাতির দাঁতে বাঁধানো তার শখের ছুরিখানা বার করে সেটা ডান হাতে উঁচিয়ে ধরে বাম হাতে পাগলার জামার কলারটা চেপে ধরে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'বল দিকিনি পাগলা এটা কি?' আসল ব্যাপারটা এতোক্ষণে পাগলার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে উত্তর

করলো, 'ওটা—ওটা ভাই ছুরি। তোরা তো আমাকে মেরেই ফেলবি।
আমি কিন্তু ভাই একেবারে নির্দোষ।' উত্তরে খেঁদা ভাবগম্ভীর স্বরে
তাকে বললো, 'ও সব কথা আর নয়। বিচার হয়ে গিয়েছে। এই বার
শাস্তির জন্য প্রস্তুত হও। তবে হাঁ, একটা কথা। তোর কোনও শেষ
ইচ্ছে আছে?'

'হঠাৎ পাগলার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, 'আমি নলিনাকে
একবার দেখবো।' পাগলার এই কথায় আমরা অবাক হয়ে
গিয়েছিলাম, এ্যাঁ! পাগলা বলে কি? যে নলিনাকে নিয়ে এত কাণ্ড
সেই নলিনাকেই সে দেখবে! হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম খাঁদার চোখ
দুটো জল জল করে জ্বলে উঠলো। চারি দিকে শুধু অন্ধকার। দেখা
যায় সেখানে শুধু খাঁদার দুটো চোখ ও তার হাতের ধারালো চকচকে
ছুরিখানা। এইরূপ অবস্থায় খাঁদা প্রায়ই হয়ে যেতো একটা নির্দয়
পশুর মত। এমন কি, সেই সময় তার চেহারাও যেত বদলে। এই
সময় আমরা পর্যন্ত তার ভয়ে শিউরে উঠতাম। হিংস্র পশুর মত
এগিয়ে এসে খাঁদা আমাদের হুকুম করলো, 'ধর বেটাকে ভাল করে!'
আমি আর গোপীবাবু দুই দিক থেকে এসে তার দুই হাত
সজোরে চেপে ধরলাম। খাঁদাবাবুর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে
প্রতিপালন করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তরও ছিল না। অন্ধকারের
মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি যে পাগলার চোখ দুটো ভয়ে বুজে গিয়েছে।
দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে খাঁদাবাবুর কিছু জ্ঞান ছিল। তার ঘরে
আমি কয়েকটি অ্যানাটমির চার্ট টাঙানো দেখেছি। হৃৎপিণ্ড,
ফুসফুস প্রভৃতির অবস্থিতি তার অজানা ছিল না। হঠাৎ আওয়াজ
হলো, ফ্যাঁচ—ফ্যাঁচ—ফ্যাঁচ। হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে খাঁদা তিন তিন বার
তার ছুরিখানা পাগলার বুকের ভিতর বসিয়ে দিলে। বিনা প্রতিবাদে
পাগলের দেহটা রক্তাপ্লুত অবস্থায় মাটির উপর লুটিয়ে পড়লো।

'ব্যাপারটা দেখে আমরা সকলেই একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। হাজার হোক পাগলা বাবু আমাদের পরিচিত ছিল। আমাদের মনের এই দুর্বলতা খাঁদার চোখ এড়ায়নি। সে এইবার আমাদের সাহস দিয়ে বলে উঠলো, 'কি রে ভয় পেয়েছিস ? এই কি আমাদের প্রথম কাজ ? এতো ভয়ের কি আছে ?' এর পর খাঁদা ধীর স্থির মস্তিষ্কে গোপীবাবুকে আদেশ জানালো, 'যা, তোর ডলিকে নিয়ে এখন তুই হাওড়ার দিকে সরে পড়। আমিও আজ মলিনাকে নিয়ে কলকাতা ছাড়বো।' গোপীবাবু খাঁদার নির্দেশ মত ঐ স্থান থেকে চলে গেলে খাঁদা আমাকে নিয়ে তার কুমারটুলির বাড়িতে আসে। এই সময় সামনের রকটায় বসে পাড়ার দেবেনবাবু হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের জামা-কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে সে দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের জিজ্ঞেস করলো, 'কি রে! তোদের জামা-কাপড় আতো রাঙা কেন ?' খাঁদা তার জামার আস্তিনার ভিতর হতে তার ধারালো ছুরিখানা বার করে ইশারায় তাকে চুপ করতে বললে দেবেনবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেখানে চুপচাপ বসে পড়ল। সেই সুযোগে আমরা খোকার বাটীর ভিতর এসে আমাদের রক্তমাখা জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে ফেলি। এর পর খেঁদার আবার কি খেয়াল হলো, কে জানে! সে আমাকে নিয়ে পুনরায় অকুস্থলে ফিরে আসে। ওখানে যাবার সময় একটা ভোজালিও সে জোগাড় করে। ভোজালিটা দিয়ে সে পাগলার গোড়ালির শিরা দুটো কেটে দেয় এবং তারপর সে পাগলার মুণ্ডটাও এক কোপে বিচ্ছিন্ন করে আমাকে একটা চটের বোরা আনবার জন্যে আদেশ জানায়। আমি চটের একটা থলে সংগ্রহ করে সেখানে ফিরে এসে দেখি যে, সেখানে খোকা নেই। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখি খবরের কাগজে মোড়া পাগলার কাটা মুণ্ডটা তার কোঁচার খুঁটে আড়াল করে খোকা সেখানে ফিরে আসছে। আমাকে সেখানে দেখে খাঁদা

গর্বভরে আমাকে জানালো, 'জানিস, ন্যাকড়ায় জড়িয়ে পাগলার এই মুণ্ডটা মলিনাকে দেখিয়ে এলাম। আর সেই সঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করে এলাম যে এর পর আর কাউকে সে ভালবাসবে কি না? তার প্রিয়তমের এই কাটা মুণ্ডটা দেখে বেটী একেবারে দাঁত ছিরকুটে সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সেই অবস্থাতেই বেটীকে সেখানে ফেলে রেখে আমি চলে এসেছি।' এর পর খোকা আমার আনা সেই বোরাটার মধ্যে পাগলার ঐ মুণ্ডটা পুরে নিয়ে গঙ্গার ঘাটে আসে। ঘাটের উপরদিককার একটা পৈঠার উপর খাঁদার পিতার এক বন্ধু সন্ন্যাসীবাবু একটা পোষা কুকুর নিয়ে বসেছিল। খাঁদাকে মুণ্ড সমেত বোরাটা জলে ফেলতে দেখে ভদ্রলোক তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি রে খাঁদা, কি ফেল্‌লি রে জলে?' কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে খাঁদা উত্তরে তাকে জানিয়েছিল, 'ও কিছু নয়। একটা মরা বেরাল।'

'এদিককার সব কাজ ফতে করে আমরা একটা সরু গলির পথ ধরে ফিরে আস'ছিলাম। এমন সময় আমরা লক্ষ্য করলাম, খাঁদার জুতা দুটো রক্তে ভিজে গিয়েছে। এইজন্য খাঁদা তার জুতো দুটো একটা গর্তের মধ্যে গুঁজে দিয়ে শুধু পায়ে চলে আসে। হাঁ হুজুর! জুতা দুটো এখনও সেখানে আছে। ঐ জায়গাটা এখুনি আপনাদের আমি দেখিয়ে দিতে পারি। এর পর খাঁদার কৃপানাথ লেনের ঐ বাড়িতে আমরা পুনরায় ফিরে এসে উভয়ে আর একবার আমাদের জামা-কাপড় ছাড়ি। এই জন্যেই আপনারা ঐখানে দুই প্রস্থ রক্তমাখা জামা-কাপড় দেখতে পেয়েছিলেন।

'এর পর হতে খাঁদার মনের মধ্যে কি হয়েছিল কে জানে? সে আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও সেই হত্যার স্থলে বারে বারে ফিরে যেতো। সে যাকে তাকে নিজের এই বীরত্ব সম্বন্ধে ফলাও করে গল্প করতো।

ব্যাপার সুবিধে নয় বুঝে আমি খাঁদাকে নিয়ে দেওঘরে চলে আসি। সেইখানে খাঁদা 'রাজা অফ কুমারটুলি' এই নামে পরিচয় দেয় এবং এর ফলে আমাকেই সেখানে খাঁদার দেওয়ান সাজতে হয়। আমরা এইখানে দান-ধ্যান শুরু করি। ভিখারীদেরও সেখানে খাওয়াতে থাকি। দুই একদিন সেখানকার সরকারী কর্মচারীদের সান্ধ্য ভোজে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েও দিই। আমাদের রাজোচিত ব্যবহারে দেওঘরবাসীরা মুগ্ধ হয়ে ওঠে। এই সময় খাঁদার খেয়াল হয় তার রাণীকে—অর্থাৎ কি না মলিনাকে সে সেখানে নিয়ে আসবে। আমরা শুনেছিলাম যে আপনারা মলিনার বাটীতে পাহারা বসিয়েছেন। হাঁ হুজুর! আপনি ঠিকই জেনেছিলেন যে মলিনাকে না দেখে খাঁদা কিছুতেই থাকতে পারে না। মলিনাকে দেখবার জন্যে তাব ওখানে তাকে আসতেই হবে। তবে আপনারা যেমন আমাদের উপর নজর রাখবার জন্যে গুপ্তচর নিয়োগ করে থাকেন, আমরাও তেমনি আপনাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য বেতনভুক গুপ্তচর রেখে থাকি। আমাদের নিযুক্ত গুপ্তচরেরা কলিকাতা হতে খবর দিয়েছিল যে কয়েক দিন হলো মলিনার ওখানে আপনারা পাহারা দেবার জন্য সিপাহীদের আর পাঠাচ্ছেন না। আপনাদের এই ভাঁওতায় ভুলে গিয়ে মলিনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেওঘরে নিয়ে যেতে এসেই না আমি আপনাদের হাতে ধরা পড়ে গেলাম। হাঁ হুজুর, খাঁদার দেওঘরের আস্তানা আপনাকে আমি দেখিয়ে দেবো। সে এখনও সেখানে আছে এবং আমার জন্য সেখানে সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু দেখবেন হুজুর, আমার এই স্বীকারোক্তির কথা যেন সে জানতে না পারে। একথা সে জানতে পারলে তার হাতে আমারও মৃত্যু নিশ্চিত। হাঁ, এই ব্যাপারে একটা জরুরি কথা আপনাদের আমি বলতে ভুলে গিয়েছি। পাগলাকে হত্যা করার পরদিনই খোকা আমাকে নিয়ে তার প্রতিশ্রুতি মত সেই পলাতক

গৌরীর খোঁজে শেওড়াফুলি যায় এবং সেখানে গিয়ে তাকে এবং তার বন্ধুদের মারপিট ক'রে আসে। আমি যে সত্য কথা বলছি তা সেখানে গিয়ে আপনি এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে জানতে পারবেন। আসলে খাঁদা কাউকে কখনও ক্ষমা করে নি। আমাকেও এইজন্যে সে ক্ষমা করবে না। আপনারা দেখবেন হুজুর! সে আমাকেও তার প্রতি এই বেইমানির জন্য হত্যা করবে। আপনিও খুব সাবধানে থাকবেন। দেওঘরের রাস্তায় যদি একবার সে আপনাকে দেখে তো তৎক্ষণাৎ সে আপনাকে গুলি করে মারবে।"

আসামী কেষ্টবাবুর এই দীর্ঘ বিবৃতি সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করে আমি ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম যে ভোর পাঁচটা বাজতে চলেছে। ভোরের হাওয়া ও সেই সঙ্গে ভোরের আলো আসামী কেষ্টবাবুর গাত্রস্পর্শ করা মাত্র কিন্তু কেষ্টবাবু সচেতন হয়ে উঠলো। খুব সম্ভবত কেষ্টবাবু এই সময় ভাবছিল যে সে এ কি করলে? আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে কেষ্টবাবু অনুশোচনায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে! সে তার সম্বিত ফিরে পেয়ে হয়তো ভেবেছিল যে, সে নিজে তো মরলোই—সেই সঙ্গে সে তার গুরুজীর প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করে বসলে। এই সময় হঠাৎ শুনলাম যে কেষ্টবাবু ক্ষেপে উঠে আমাকে বলছে, 'আপনি আচ্ছা শয়তান তো মশাই? ফাঁকি দিয়ে সব কথা বার করে নিলেন। যা খুশি আপনি করতে পারেন। আমি আপনাকে আর কিছুই বলবো না।' কিন্তু কেষ্টবাবুর বলবার আর বিশেষ কিছু বাকি ছিল না। প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু ইতিমধ্যেই আমি তার কাছ থেকে জেনে নিয়েছি। কেষ্টবাবু দেওঘরের খোকার আস্তানার ঠিকানা ইতিপূর্বেই আমাকে বলে দিয়েছিল। উপরন্তু সে নিজে হাতে তার সেইখানকার সেই বাড়িটার একটা নক্সা আশে-পাশের পথঘাটের পরিপ্রেক্ষিতে এক টুকরো কাগজের

উপর আমাকে এঁকেও দিয়েছিল। কেষ্টবাবুকে আমার আর কোনও প্রয়োজন না থাকায় তাকে এইবার আর্নি হাজত ঘরে পুরবার জন্য পাহারাদার সিপাহীদের আদেশ দিযে লিপিবদ্ধ বিবৃতিটি অনুধাবন করে তা থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলির সত্যতা যাচাই করবার জন্য সেইগুলি পৃথক ভাবে একটি কাগজে টুকে নিলাম। আসামী কেষ্টবাবুর এই বিবৃতির মধ্যে এই হত্যা সম্পর্কে কয়েকজন মূল্যবান সাক্ষীর নাম পাওয়া গিয়েছিল। এই সকল সাক্ষীর মধ্যে ছিল সত্য গোয়ালা, হারু গোঁসাই এবং সন্ন্যাসী ঠাকুর। আমি এর পর দিনের আলো ফুটে উঠতেই বাইরে বেরিযে পড়ে এই তিন জনা অতি প্রয়োজনীয় সাক্ষীকে খুঁজে বার করে থানায় এনে হাজির করলাম। ইতিমধ্যে সুনীলবাবুও চা পান সমাপনান্তে থানার আফিসঘরে নেমে এসেছেন। পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসিত হয়েও এই তিন জন সাক্ষী আসামী কেষ্টবাবুর বিবৃতির অনুরূপই এক-একটি বিবৃতি আমাদের নিকট প্রদান করেছিল। এই নিরপেক্ষ সাক্ষী তিনটির সাক্ষ্য হতে বুঝা গেলো যে আসামী কেষ্টবাবু গত রাত্রে এই খুন সম্পর্কে আমার নিকট সত্য কথাই বলেছে। কিন্তু বহু সাধ্যসাধনা করা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে গিয়ে তার বিবৃতি অনুযায়ী সেই গলি হতে খোকা বাবুর পরিত্যক্ত রক্তমাখা জুতা জোড়াটি বার করে দিতে সে রাজি হলো না। আমি প্রস্তাব করলাম যে আমরাই ঐ গলিটি তন্ন তন্ন করে খুঁজে ঐ রক্তমাখা জুতা দুটি উদ্ধার করে আনবো। কিন্তু ইনস্পেকটার সুনীল রায় অভিমত প্রকাশ করলেন যে, আসামী নিজে পুলিশকে অকুস্থলে নিয়ে গিয়ে ঐ জুতা জোড়াটি তাদের দেখিয়ে না দিলে আদালতের নিকট প্রামাণ্য দ্রব্যরূপে উহার কোনও মূল্য থাকবে না। এই জন্য ইনস্পেকটার রায় আমাদের উপদেশ দিলেন যে, এই সম্পর্কে পুনরায় কেষ্ট বাবুর

সুবুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই সমীচীন হবে। কিন্তু এর পর শত চেষ্টা করেও আমি তার মধ্যে তার পূর্বের মনোভাব আর ফিরিয়ে আনতে পারি নি। অগত্যা এর পরের দিনেই তাকেও গোপীবাবুর মত আমাদের জেলহাজতে পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল। এই সময় আসামী কেষ্ট বাবু ক্ষোভে অভিমানে অতিষ্ঠ হয়ে বারে বারে হাজত ঘরের লোহার গরাদের উপর মাথা ঠুকে রক্তারক্তি করছিল। এই জন্য তাকে আর একদিনও পুলিশ হেপাজতিতে রাখতে আমাদের সাহস হয় নি।

এক্ষণে আসামীদের মধ্যে সকলকেই একে একে আমরা গ্রেপ্তার করতে পেরেছি। বাকি ছিল শুধু মূল হত্যাকারী ঐ দলের নেতা খোকা ওরফে খেঁদা। পরিশেষে এই রাবণ-বধের ভারও আমাকেই স্বেচ্ছায় আপন স্কন্ধে তুলে নিতে হয়েছিল। এই সময় একটি পারিবারিক দুর্ঘটনা আমাকে জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধে বেপরোয়া করে তুলেছিল। এই জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকলেও আমিই উপযাচক হয়ে খোকার সন্ধানে দেওঘরে যাত্রা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে পড়লাম।

সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়ে গিয়েছে যে আমাকেই আসামী কৃষ্ণলাল প্রদত্ত 'খোকার দেওঘরের বাসস্থান নির্দেশক' নক্সাসহ খোকাবাবুকে গ্রেপ্তার করার জন্য ঐ শহরটিতে যথাশীঘ্র রওনা হয়ে যেতে হবে। এই দেওঘর শহরটি পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশে অবস্থিত। এই জন্য কলিকাতা শহর হতে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে সেখানে আমাদের যাওয়া চলে না। এ ছাড়া পুলিশের পোশাকে প্রকাশ্যে দল বেঁধে সেখানে গেলে খোকাবাবুর মত একজন দুর্দান্ত খুনে গুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করা অসম্ভব হবে। এর কারণ খোকাবাবুরও আমাদের মত লোকবল আছে। এই সব বেপরোয়া খুনে গুণ্ডাদের সতর্ক দৃষ্টি

এড়িয়ে সেখানে না গেলে তারা যে কোনও মুহূর্তে পাততাড়ি গুটিয়ে ঐ শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে পারে। অন্যথায় তাদের সঙ্গে আমাদের সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ হওয়াও বিচিত্র নয়। পরিশেষে সকল দিক বিবেচনা করে আমি ছদ্মবেশে একজন মাত্র সঙ্গীসহ দেওঘরের উদ্দেশে যাত্রা করতে মনস্থ করলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার সঙ্গীরূপে আমার সঙ্গে কা'কে নিয়ে যাবো? আমি এমন একজনকে আমার সঙ্গীরূপে চাইছিলাম যে খোকাবাবুকে এক দৃষ্টিতে চিনে নিতে পারবে। এই সম্পর্কে খোকাবাবুর বাল্যবন্ধু দেবেন বাবু কিংবা হরিপদকেই আমাদের উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু দেবেন বাবু আমাদের সঙ্গে কিছুতেই দেওঘরে যেতে রাজি হলেন না। আমি তাঁকে মানবতা, লোকহিতৈষণা, দেশপ্রেম, নাগরিক কর্তব্যবোধ প্রভৃতি বহুবিধ সূক্ষ্ম বৃত্তি সম্ভূত বাক্যাবলী দ্বারা তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত করতে সচেষ্ট হলাম। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়, তাঁর সেই এক কথা, 'নূতন বিয়ে করেছি মশাই, আমি মারা গেলে আমার বৌকে আপনারা খেতে দেবেন?'

অগত্যা তাঁকে পরিত্যাগ করে আমি খোকার অপর বাল্যবন্ধু হরিপদর শরণাপন্ন হলাম। বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর হরিপদ বাবু ওরফে হরিপদ সরকার একটি বিশেষ শর্তে দেওঘর পর্যন্ত আমার অনুগামী হতে স্বীকৃত হলো। প্রথমত খোকা ধরা পড়ার পর তবে তাকে খোকাকে সনাক্ত করার জন্য ডাকা হবে। দ্বিতীয়ত খোকার গ্রেপ্তারের পর ছয় মাস পর্যন্ত তার বাটীতে পুলিশী পাহারার ব্যবস্থা করা হবে। এই দুইটি শর্ত আমরা আমাদের তৎকালীন উত্তর কলিকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের অনুমতিক্রমে মেনে নিয়েছিলাম। যাক, একজন সনাক্তকরণকারী সঙ্গী তো পাওয়া গেল, কিন্তু এখন ছদ্মবেশ ধারণ আমার পক্ষে কিরূপ ভাবে করা যাবে? এই সময় পুলিশ

বিভাগে দাড়ি-গোঁফ পরা বা রঙমাখা প্রভৃতির ন্যায় অসাধারণ ছদ্মবেশ ধারণের রীতির প্রচলন ছিল। কিন্তু আমি শুরু হতেই এইরূপ ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এসেছি। আমি, ইনস্‌পেক্টার সুনীল বাবু এবং আমার জনৈক ফটোগ্রাফার বন্ধুর সাহায্যে এই বিষয়ে একটি নূতন মতবাদের সৃষ্টি করেছিলাম। আমার নির্দেশে আমার ফটোগ্রাফার বন্ধু নিতাই দাস এই শহরের বিবিধ পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক বেশভূষা সহ অসংখ্য আলোকচিত্র ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছিল। এই সকল ফটোগ্রাফের মধ্যে স্ব স্ব পেশায় নিরত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, উড়িয়া, পেশোয়ারী, কর্মরত মুচি ও নাপিত, ফেরিওয়ালা, ভ্রাম্যমান সাধু, তীর্থযাত্রী বাঙ্গালী, রিক্সাওয়ালা, ভাটিয়া বণিক, বাঙালী জোতদার ইত্যাদি বহু ব্যক্তির স্বাভাবিক বেশভূষা ও চেহারার ফটো ছিল। আমাদের পরামর্শসভায় সমবেত হয়ে প্রায় সব কয়টি চোহারার ফটো অ্যালবামের পাতা ঘেঁটে আমি একটা পেশোয়ারী হিন্দু ভদ্রলোকের ফটোচিত্র মনোনীত করলাম। আমার বর্ণ ও দীর্ঘ দেহের সহিত সামঞ্জস্য রেখে আমি এই ফটো-চিত্রটি আমার ছদ্মবেশের জন্য বেছে নিয়েছিলাম। ঐ ফটো-চিত্রে প্রদর্শিত ভদ্রলোকটির বেশভূষা ও হাবভাব অনুকরণ করতে আমার একটুমাত্রও দেরি হয়নি। বস্তুতপক্ষে এইরূপ ভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করে আর্শির সামনে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকেই নিজে চিনতে পারছিলাম না। এর পর পর্যাপ্ত অর্থ ও একটি টোটাভরা পিস্তল কোমরে গুঁজে, খোকার বাল্যবন্ধু হরিপদকে সঙ্গে করে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের উৎকণ্ঠা উপেক্ষা করে ও সেই সঙ্গে তাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা শিরোধার্য করে আমি দেওঘর শহরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম। খোকাবাবুর দলের লোকজনেরা, এমন কি তাদের নিযুক্ত উকিলরাও যে আমাদের গতিবিধি সম্বন্ধে থানার আশে-পাশে কিংবা হাওড়া স্টেশনের কাছে

দেওঘরে তদন্তকারী অফিসার
পঞ্চানন ঘোষাল—ছদ্মবেশে
(১৯৩৬)
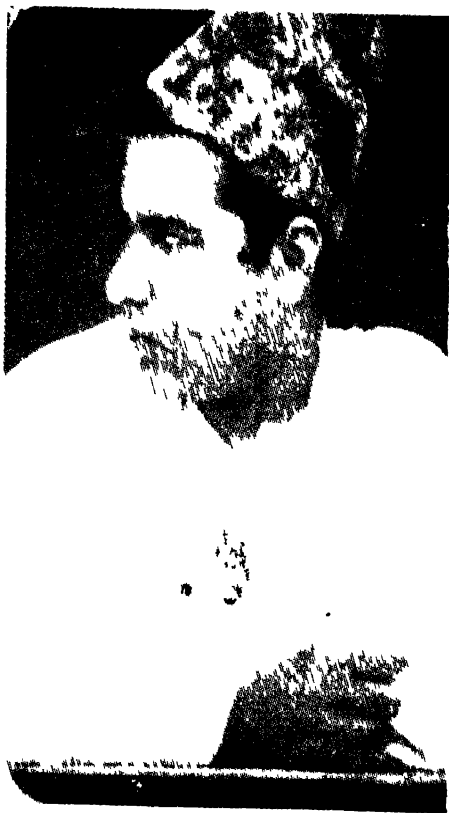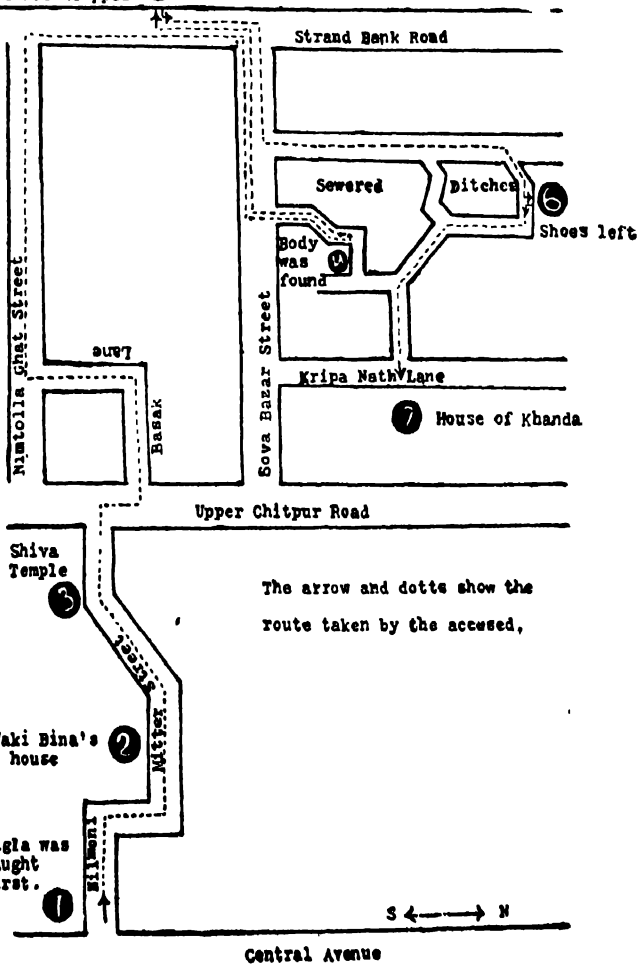
Plan showing the route taken by the accused with Pagla in a taxi

সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহের নক্সা

নজর রাখে, তাতে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম। এই জন্য আমরা একটি প্রাইভেট মোটরকার যোগাড় করে মালপত্রবিহীন অবস্থায় তাতে উঠে প্রথমে নৈহাটি পর্যন্ত চলে আসি এবং তার পর পুনরায় ফিরে এসে উইলিংডন ব্রিজ পার হয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে আসানসোল স্টেশনে এসে আমাদের বেশভূষা অনুযায়ী ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাশের একটি কামরায় উঠে বসি।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমবা ভোরের আলোয় দেওঘর শহরে এসে পৌঁছলাম। প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করবো। কিন্তু পরে এই ইচ্ছা পরিত্যাগ করে আমরা শহরে একটি পৃথক গৃহ ভাড়া করে সেখানে আস্তানা গাড়লাম। এর পর আর একটু মাত্রও সময় নষ্ট না করে পরদিন আমি হরিপদ বাবুকে বাসায় রেখে বাটী ভাড়া করার অছিলায় একেবারে খোকাবাবুর বিলাসী টাউনের ভাড়া করা বাটীর নিকট এসে দাঁড়ালাম। খোকাবাবুর ডেরা হতে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে আমি ইতস্তত ঘুরাফিরা করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমি লক্ষ্য করলাম একখানি নাতিবৃহৎ বাটীর দরজার পাশে একটা নেমপ্লেট সাঁটা রয়েছে। এই নেমপ্লেটটিতে লেখা ছিল—"রাজা অফ কুমারটুলি"। কুমারটুলি স্থানটি যে কলিকাতার একটি মহল্লা তা বোধ হয় দেওঘরবাসীদের জানা ছিল না। সম্ভবত তারা উহা বাঙলার কোনও এক জেলার অন্তর্ভূক্ত স্থান মনে করেছিল। এই জন্য উহা তারা রাজন্যবহুল বাঙলাদেশে কোনও জমিদারের আবাসভূমির নাম ব'লে বিশ্বাস করে থাকবে। আমি চতুরতার সহিত গোপন তদন্ত দ্বারা জানতে পারলাম যে, সপারিষদ রাজাবাহাদুর বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সেখানে বাস করেন। তাঁদের রাজোচিত ব্যবহার ও দানধ্যানের জন্য এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলেই মুগ্ধ।

এ ছাড়া ইনি কয়েকবার শহরের রাজপুরুষদের নিমন্ত্রণ করে য়ুরোপীয় কায়দায় খাইয়েও দিয়েছেন। এর পর আমার আর বুঝতে বাকি থাকে নি যে আমাদের অন্যতম খুনে আসামী খোকাবাবুই এখানে এসে ভোল বদলিয়ে 'রাজা অফ কুমারটুলি' সেজে আসর জমিয়েছেন।

পথ চ'লতে চ'লতে আমি ভাবতে লাগলাম যে এর পর কি করা যায়। একমাত্র সশস্ত্র সিপাহী দলের সাহায্যে খোকাবাবুকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব। বিনা গুলি বিনিময়ে জীবিত অবস্থায় খোকাবাবু যে ধরা দেবে না, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ছিলাম। এই সময় হঠাৎ আমার একজন আত্মীয় শ্রীরবীন্দ্র ব্যানার্জির কথা মনে পড়ে গেলো। ইনি এই সময় দেওঘরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরূপে বহাল ছিলেন। কোর্টের নিকট তাঁর সবকারী কোআর্টাবে তিনি সপরিবারে বসবাস করতেন। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করে এই সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করবো। কিন্তু এই সময় খোকাবাবুব চিন্তাতে আমার মন এমনই ভরপুর ছিল যে অচিরে তাঁর অস্তিত্ব পর্যন্ত আমি ভুলে গেলাম।

শহর দেখবার অছিলায় আপন মনে পথ চলছিলাম। একবার আমার মনে হলো আমাদের ভাড়া করা বাড়িটাতে ফিরে যাই। বহুক্ষণ ঘুবা-ফিরা করবার জন্য একটু বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। খোকাবাবুর বাল্যবন্ধু হরিপদ হয়তো অধীর হয়ে আমার জন্য আমাদের ভাড়া-করা বাড়িটাতে বসে অপেক্ষা করছে। এইখানকার সদ্যপ্রাপ্ত সমাচার সম্বন্ধে আমার পক্ষে তাকে একবার জানানও দরকার। তবু আমার মনে হলো যে আমার পক্ষে স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া উচিত হবে। আমি ধীর পদবিক্ষেপে থানার পথ ধরে থানায় এসে উপস্থিত হলাম। থানার অফিসার-ইন-চার্জ সুরেশবাবু ছিলেন একজন বাঙ্গালী অফিসার।

আমাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে তিনি বললেন, 'আরে মশাই! আপনি এসে গেছেন? কাল থেকে শুনছি যে কোলকাতা থেকে একজন পুলিশ অফিসার এখানে তদন্তে এসেছেন। কিন্তু কোথায় যে তিনি এসে উঠেছেন তা এতো চেষ্টা করেও খুঁজে বার করতে পারলাম না।' দেওঘর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের এই খোঁজা-খুঁজির বহরে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। আমাদের খুঁজতে তিনি কুমারটুলির রাজার কাছে যান নি তো? তা'ছাড়া এই শহরে আমাদের আগমনের বার্তা তিনি এত শীঘ্র জানলেনই বা কি করে?

হঠাৎ আমার চিন্তার ধারা বিচ্ছিন্ন করে সুরেশবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা খাওয়া দাওয়া করছেন কোথায়? কাল রাত্রি থেকে আপনি আছেনই বা কোথায়? আজ থেকে আমার কোআর্টারে থেকে এইখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। আপনাকে খুঁজে বার করবার আগেই আমাদের বাইরেকার ঘরটায় আপনার জন্যে একটা খাটিয়ায় বিছানা-পত্র ঠিক করে রেখেছি।'

দেওঘর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের এই অতিথিবাৎসল্য ও আগ্রহাতিশয্যে আমি লজ্জিত হয়ে পড়ছিলাম। আমরা কোলকাতা পুলিশের লোক। বাহির হতে কোন অফিসার এলে নিজেদের মধ্যে তাকে মেঠো পুলিশ বলে বহু ঠাট্টা-বিদ্রূপও করেছি। এমন কি, আমাদের কেউ কেউ তাদের অপেক্ষমান দেখেও পাশ কাটিয়ে অফিসঘরে চলে এসেছে। কিন্তু আমরা কোনও কার্যব্যপদেশে শহরের বাহিরের কোনও থানায় এসে উপস্থিত হলে তাঁরা সাধ্যমত তাঁদের এক্তিয়ারভুক্ত যান-বাহন যোগে পুলিশী তদন্তকার্যে আমাদের সাহায্য তো করেছেনই, অধিকন্তু আমাদের জন্য তাঁরা ধবধবে পরিষ্কার মশারি সহ দুগ্ধফেননিভ শয্যা ও মাংস দধি মিষ্টান্ন দুগ্ধ সমভিব্যাহারে পঞ্চব্যঞ্জন সহ অতি

চিকণ অন্নেরও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে একজন সাময়িক স্ত্রী ব্যতীত জামাই আদরের প্রতিটি উপকরণই তাঁরা আমাদের জন্য সরবরাহ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। আমরা তৎকালে মাত্র নিজেদেরই কেন যে সুসভ্য পুলিশ ব'লে মনে করতাম তা যেন আজ আমার ধারণার বাইরে। অথচ তাদের কাছে সমস্ত পুলিশেরই ছিল সমান আদর। একজন পুলিশ সাহেব ও একজন নিম্নতম পদের কনস্টেবল অতিথি হিসেবে তাঁদের কাছে সমান ভাবেই আদর পেয়ে এসেছেন। একবার তাঁদের কাছে গিয়ে বললেই হলো যে আমি পুলিশ বিভাগের একজন লোক হিসাবে আপনাদের সাহায্য প্রার্থী। কি মাদ্রাজ, কি বোম্বাই, কি মহারাষ্ট্র, কি বিহার —ভারতের প্রতিটি প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের পুলিশের মধ্যে আমি দেখেছি অতিথিসেবা ও ভ্রাতৃবাৎসল্যরূপ সেই একই ভারতীয় ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতার মেট্রোপলিটন পুলিশদের মধ্যে আমি দেখেছি—য়ুরোপীয় সভ্যতার শুধু নির্মম একটা যান্ত্রিক অভিব্যক্তি। কলিকাতা পুলিশের একজন অফিস'র বিধায় লজ্জিত হয়ে উঠে আমি ভাবলাম, কাল ইনি কোলকাতায় এসে শ্যামপুকুর থানায় এলে হয়তো আমি জিজ্ঞাসাও করবো না যে ইনি কোথায় থাকবেন ও আহারাদি করবেন। বরং নির্বিকার চিত্তে আমি দেখবো ও উপভোগ করবো যে তিনি থানা হতে বার হয়ে গিয়ে ট্রামের রাস্তার ওপারে জনতার ভিড়ের মধ্যে বেমালুম মিলিয়ে যাচ্ছেন।

আমরা তাঁদের থানায় গেলে তাঁদের গৃহিণীরা পর্যন্ত অতিথি-সেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের অনেকেই স্বহস্তে পরিবেশন করে আমাদের খাইয়েও দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তাঁদের ওপরে নিয়ে যাবো বা তাঁদের জন্যে যে এতো বেলাতে রান্নাঘরে ঢুকতে হবে আমাদের গৃহিণীদের নিকট তা কল্পনারও বাইরে ছিল।

এই থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের এইরূপ অমায়িক ব্যবহার সত্ত্বেও আমি কিন্তু তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে সকল বার্তা তাঁকে এখুনি জানিয়ে দেওয়া সমীচীন মনে করলাম না। এই সময় শুধু তাঁকে এইটুকু আমি বললাম যে কুমারটুলির একজন খুনে গুণ্ডাব খোঁজে আমরা এখানে এসেছি। তাঁর কাছে এ-ও শুনলাম যে, স্টেশনে সাদা পোশাকে পাহারারত একজন সিপাহী প্লাটফর্মে আমার ও হরিপদর মধ্যে কয়েকটা কথাবার্তার আদান-প্রদান দূর হতে শুনে বুঝে নিয়েছিল যে আমরা কোলকাতা পুলিশ থেকে এখানে একটি মামলার তদন্তের জন্য এসেছি। আমাদের পুলিশ বলে নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারার জন্যে সে আমাদের অলক্ষ্যে অনুসরণ করে নি। উর্ধ্বতন অফিসারদের কাছে প্রায়ই কয়েকটি উপদেশবাণী শুনতাম, যথা—'বাজার হতে ক্রয় করো, কিন্তু সেখানে নিজের জিনিস বিক্রয় করো না। লোকের কথা শুনে যেও, কিন্তু নিজে বেশি কথা কয়ো না। পথ চলো নিঃশব্দে ও আশে-পাশের লোকেদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখো,' ইত্যাদি। কিন্তু এই অমূল্য উপদেশ আমরা সেদিন ভুলে গিয়েছিলাম।

আজ সম্যক ভাবে উপলব্ধি করলাম, এ মূল্যবান উপদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলে জীবন পর্যন্ত সংশয় হতে পারে। ভগবান আমাদের প্রতি সদয় যে ঐ দিন আমাদের ঐ সব কথাবার্তা খোকাবাবুর কোনও গুপ্তচর শুনে নি। পুলিশেরই জনৈক কনস্টেবলের মাত্র তা কর্ণগোচর হয়েছিল। সকল কথা শুনে ভারপ্রাপ্ত অফিসার সুরেশবাবু বললেন, 'আচ্ছা, এখানে তো কুমারটুলির রাজাবাহাদুর কিছুদিন আছেন। তাঁর লোকজনদের নিকটে গোপনে তাঁর সম্বন্ধে খোঁজ নিলে হয় না? তবে রাজাবাহাদুরটা অতি পাজি ও অহঙ্কারী। দারোগাদের একেবারে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। ওর মেলামেশা

শুধু বড়োদের সঙ্গে। আমরা যেন মানুষই নই। এমন কি তাঁর গেটে দুই দিন পাহারার ব্যবস্থাও আমাকে কর্তৃপক্ষের আদেশে করতে হয়েছিল। আইনে একবার পেলে দেখে নিতাম তাঁকে।' আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে শুধু এইটুকু জানালাম যে কোলকাতায় তাঁর বিরুদ্ধে কয়েকটা মামলা আছে। শীঘ্রই তিনি চারটে গ্রেপ্তারি ওআরেণ্ট পাবেন। সেই সময় তিনি দেওঘরবাসীর কাছে বেইজ্জত হয়ে তাঁর এই সব দুর্ব্যবহারের জন্য উচিত শাস্তি তো এমনিই পাবেন। কাল থেকে তাঁর ওখানে এসে আমরা আতিথ্য গ্রহণ করবো বলে প্রতিশ্রুতি দিলে তবে তিনি আমাকে বিদায় দিতে রাজি হলেন। এ ছাড়া তিনি এক ব্যক্তিকে আমাদের খবরদারি করবার জন্য আমার সঙ্গে পাঠাবার জন্য জিদও করেছিলেন। এর পর তিনি একটা টাঙ্গা গাড়ি ডেকে আমাকে তাতে তুলে দিয়ে গাড়োয়ানকে তার প্রাপ্য (?) ভাড়াটা নিজেই চুকিয়ে দিলেন।

আমার নির্দেশমত টাঙ্গা গাড়িখানা আমাদের ভাড়া-করা বাসাবাড়ির দিকে ছুটে চলছিল। ঠিক এই সময় আবার আমার মনে পড়লো আমাদের জনৈক আত্মীয় ভদ্রলোক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জির কথা। পূর্বেই বলেছি যে, তিনি এই সময় দেওঘর কোর্টের একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদে বাহাল ছিলেন। তিনি দেওঘর সাবডিভিশনের সেকেণ্ড অফিসার বিধায় পদমর্যাদায় ঠিক এস-ডি-ও সাহেবের নিচে। তাঁর কথা মনে পড়ামাত্র আমি টাঙ্গাচালককে 'হাকিম লোককো বাঙ্গালো'র দিকে তার গাড়িখানি চালাবার জন্য নির্দেশ দিলাম। আমাদের ইনফরমার হরিপদ সরকার এদিকে আমাদের বাসাবাড়িতে আমার জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের আশু কর্তব্য সম্বন্ধে ক্ষমতায় আসীন আমাদের এই আত্মীয় বন্ধুটির সহিত পরামর্শ করবার আমি বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছিলাম।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বাটীতে এসে যখন আমি পৌঁছিলাম তখন সকাল দশটা বেজে গিয়েছে। আমাকে দেখে আমাদের রবিদা ওরফে রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, 'আরে তুমি হঠাৎ এখানে ?' এই সময় তিনি আদালতে যাবার জন্য পোশাক পরে বার হয়ে যাচ্ছিলেন। আমার নিকট হতে সকল সমাচার অবগত হয়ে তিনি বললেন, 'বাপরে বাপ। এ তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! বেটা আমাকেও একবার নিমন্ত্রণ করেছিল। কিন্তু আমি তার ওখানে যাই নি। আচ্ছা! তুমি এখন আমার এখানে স্নানাহার করে নাও। আমি আদালতে গিয়ে ঘণ্টা দুই 'দাঁড়ে' বসে ফিরে আসবো আখুন। এখানকার হেডকোআর্টার হচ্ছে দুমকা শহর। দুমকা থেকে আর্মার্ড ফোর্স নিয়ে আসা উচিত হবে। বিনা যুদ্ধে খোকাবাবু যখন ধরা দেবে না, তখন এইরূপ ব্যবস্থা করাই ভালো হবে। আমি ফিরে এসে এস-ডি-ও সাহেবকে বলে দুমকায় লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমারও ইচ্ছা ছিল যে, রাত্রি তিনটার সময় খোকাবাবুর বাটীটা অতর্কিতে সশস্ত্র শাস্ত্রী দ্বারা ঘেরাও করে ফেলে সজোরে বুটসহ পদাঘাতে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে তাকে গ্রেপ্তার করবো। এইরূপ অবস্থায় গুলি-বিনিময় হলেও আমাদের মধ্যে দুই তিনজনের বেশি হতাহত হবার সম্ভাবনা কম ছিল।

আমি রবীন্দ্রবাবুর উপদেশই শিরোধার্য করে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করাই সমীচীন মনে করলাম। ইতিমধ্যে আমি আমার গুলিভরা পিস্তলটি কোমরবন্ধ পেটি হতে খুলে ফেলে শ্রীমতী ব্যানার্জির নিকট জমা দিয়ে স্নান করে নিয়েছি। রবীন্দ্রবাবুর একজন আর্দালীর মারফৎ আমাদের ইনফরমার হরিপদবাবুর নিকট আমার এখানে অবস্থান ও কারণ সম্বন্ধে লিখে একটি গোপন পত্রও পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার স্নানের কার্য শেষ হলেও রবীন্দ্রবাবু ওরফে রবিদার সঙ্গে

আমার একত্রে আহার করার কথা। এদিকে তাঁর ফিরে আসতে আরও দেড় ঘণ্টাকাল বাকি। তাই কিছু জলযোগ করে ধুতি পাঞ্জাবি পরে আদালতের আশে-পাশের রম্য স্থানটি ঘুরে ফিরে একবার দেখে আসবার জন্যে আমি ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। আমি এর পর মৃদু পদসঞ্চারে ইতস্তত ঘুরাফিরা করতে বড়রাস্তায় উঠে কিছুটা দূর অগ্রসর হয়েছি, এই সময় হঠাৎ আমার নজর পড়লো সম্মুখের একটা ডাইঙ ক্লিনিঙ দোকানের দিকে। সম্মুখে যা দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীরটা যেন সজোরে দুলে উঠলো। আমার দেহের প্রতিটি শিরায় শিরায় যেন ইলেকট্রিকের শক প্রবাহিত হচ্ছিল। আমি শিউরে উঠে চেয়ে দেখলাম এক পা এক পা করে এগিয়ে এসে খোদ খোকাবাবু ওরফে খেঁদা গুণ্ডা আমার সম্মুখে এসে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। ইতিমধ্যে তার ডান হাতখানি তার ডান পকেটের মধ্যে কখন সে সেঁদিয়েও দিয়েছে। অভ্যাসমত আমিও আমার ডান হাতখানি তখুনি আমার পাঞ্জাবির ডান পকেটটাতে ঢুকিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার সেই ডান হাতখানি পকেট হতে টোটাভরা পিস্তলসহ বার করে নেওয়া আর সম্ভব হলো না। হায়, আমার নিত্যপ্রয়োজনীয় গুলিভরা পিস্তলটি এখন কোথায়? সেটি যে আমি বুদ্ধির দোষে সোহাগ করে আমার ভ্রাতৃজায়ার নিকট গচ্ছিত রেখে এসেছি! দেশীয় ব্যক্তিদের অধ্যুষিত বিলাসী টাউন ছেড়ে খোকাবাবু যে এই অফিস কোআর্টারসের কোনও রাস্তায় অতর্কিতে এসে পড়বে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। এইরূপ এক নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কয়েকটি উপদেশবাণী থেকে থেকে আমার মনে পড়ছিল। 'আগ্নেয়াস্ত্র কখনো হাতছাড়া করো না। একবার যদি তা হাতে করো তো তা যেন হাতেই থাকে। অন্যথায় কখন

আগ্নেয়াস্ত্র অনবদপেই গ্রহণ করো না। ইহার অসতর্ক হেপাজতি শুধু পরের বিপদ ডেকে আনে না, সময় বিশেষে ইহা নিজেরও বিপদের কারণ হয়ে থাকে।' কিন্তু খোকাবাবু কি আমার মত এই একই ভুল করেছে? নিশ্চয়ই সে তা করে নি। না হলে সে তার পকেটে অমন করে হাত পুরলে কেন? আমি আসামী কেষ্টর মুখে শুনেছিলাম যে খোকা কাউকে ক্ষমা করে না। কাউকে শত্রু বলে সন্দেহ করলেও তাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে মেরে ফেলে। তা ছাড়া গুলি ভরা পিস্তল ও তৎসহ একখানি ধারালো ছুরি ছাড়া সে কখনও পথ চলে নি। কেষ্টবাবু আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল যে খোকা আমাকে দেওঘরের কোনও পথে দেখতে পেলে তখনি সে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে। এর আগে কয়েকবার আমি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু এর পূর্বে এমন অসহায় ভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আমাকে কখনও দাঁড়াতে হয়নি।

এই সময় খোকাবাবু হঠাৎ দুই পা পিছিয়ে গিয়ে আমাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো, 'পঞ্চাননবাবু! আশা করি যে আপনার কাছে একটা ভালো হাতিয়ার আছে। কিন্তু আপনার কাছে যেমন একটা আছে, তেমনি আমার কাছেও একটা আছে। এমনি ভাবে দুজনেই এক সঙ্গে না মরে একটা কাজ করা যাক। আপনিও সরে পড়ুন এবং আমিও সরে পড়ি। দুজনেই ব্যাপারটা চেপে ফেলবো আখুন। কেউ আমাদের এখানে দুজনকে একত্রে এখনও দেখেনি। এতে দুজনার কারুরই কোনও বদনামের সম্ভাবনা নেই।'

খোকাবাবুর মুখে এইরূপ এক নতিবাচক বাক্য শুনে আমার মনে হলো যে তার কাছে বোধ হয় কোনও পিস্তল বা ছুরিকা নেই। তা তার কাছে থাকলে নিশ্চয়ই সে এতোক্ষণে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলতো। এইবার আমি একটু সাহস সঞ্চয়

করে খোকাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলাম, 'ওসব বাজে কথা থাক। এখন তুমি একটু মাত্র নড়েছো তো আমি তোমাকে গুলি করে মেরে ফেলবো।' আমার নিকট হতে এইরূপ একটা উত্তর পেতে পারে তা বোধ হয় খোকাবাবুর কল্পনার বাইরে ছিল। সে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আমার দিকে একবার হিংস্র পশুর মত তাকিয়ে দেখলো। তার পর ডান হাত তেমনি করেই পকেটে রেখে বাম হাতটা মুঠি করে উপরে উঁচিয়ে বললো, 'তা হলে আমাকে আর দোষ দেবেন না। আপনি মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হন। তবে তার আগে আর একবার ভেবে দেখতে পারেন।'

খোকার এই শেষ কথায় আমি ভীত-ত্রস্ত মনে দুই পাশে একবার চেয়ে দেখলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আশে-পাশে একটি মাত্রও পথচারী আমার দৃষ্টিগোচর হলো না। সাহায্যের জন্য চীৎকার করে কাকে ডাকবো? এমন একটি লোককেও নিকটে আমি দেখতে পেলাম না—যাকে সাহায্যের জন্য তখুনি ডাকতে পারা যায়।

আরও মিনিট দুই এমনি ভাবে আমরা মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরও খোকা, কিন্তু আমাকে আক্রমণ করলো না। আমার সন্দেহ হলো যে আমার মত তার কাছেও কোনও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নেই। এর পর আমি আর একটু মাত্রও দেরি না করে ছুটে গিয়ে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তির পর সে আমাকে একরকম ছুড়েই ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিলে। কিন্তু আমি এই সময় মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। আমি সজোরে তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে তাকে সেখানে ফেলে দিলাম। হঠাৎ এই সময় সেখানে একজন সিপাহীসহ পুলিশের জমাদারকে দেখা গেল। এদের একজন অপর জনকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো, 'আরে এ কা ভৈস। রাজাবাবুকে পিটল হো।' সৌভাগ্যক্রমে এদের অপর ব্যক্তি আমাকে থানার

বড়বাবুর সঙ্গে কথা কইতে দেখেছিল। অন্যথায় তারা হয়তো রাজাবাবুকে রাস্তার মধ্যে প্রহার করার জন্য আমাকেই গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতো। গোলমাল বুঝে সে এক দৌড়ে কোর্টে গিয়ে কোর্ট ইন্সপেক্টারকে খবর দিতে গেলো। ইতিমধ্যে সেখানে খোদ বড়বাবু সুরেশবাবু একজন জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন। তিনি এই সময় কোথা হতে খবর পেয়ে রবীন্দ্রবাবুর কোআর্টারে আমাকে খোঁজ করতে আসছিলেন। এই সময় আমি ধ্বস্তাধ্বস্তির মধ্যে প্রায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলাম। তবু রক্ষে যে খোকাবাবু ছুরি ও গুলি চালাতে অভ্যস্ত থাকলেও আমাদের মত রিক্তহস্ত মানুষের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তিতে অভ্যস্ত ছিল না। থানার বড়বাবু সুরেশবাবুর প্রকৃত বিষয়টি বুঝে নিতে একটুমাত্রও দেরি হয়নি। সুরেশবাবুর নির্দেশে জমাদার দিলোয়ার খান এবং পূর্ব হতে সেখানে উপস্থিত কনস্টেবলটি একত্রে খোকাবাবুকে ঘিরে ফেলে তাকে জড়িয়ে ধরলো। ইতিমধ্যে অদূরের আদালত গৃহ হতেও বহু ব্যক্তি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। এর পর যা আশা করেছিলাম তাই প্রমাণিত হোল। দেহ তল্লাসী করে খোকা বাবুর নিকট আমরা একটা পেনসিলকাটা ছুরিও পেলাম না।

খোকাবাবু সিংহ-বিক্রমে গর্জে উঠে একবার বলে উঠলো, 'জয় বাবা বৈদ্যনাথ। যাক, একটি নরহত্যার পাপ থেকে তা হলে আমি রেহাই পেলাম।' খোকাবাবু আমাকে কনগ্রাচুলেট করে খুশিমনেই জানালো যে তার অপরাধী জীবনে সে এই প্রথম নিরস্ত্র অবস্থায় রাজপথে বার হয়েছে। সে এইবার আমারই দিকে এগিয়ে এসে জানালো, 'আরে কি বলব, পঞ্চাননবাবু! সকালে বাড়ি ফিরে সবেমাত্র ছুরিটা ও গুলিভরা পিস্তলটা পেটির কাপড় হতে খুলে নিয়ে সেগুলো ট্রাঙ্কে বন্ধ করে চান করতে যাবো ভাবছি, এমন সময় কালাপাহাড়

এসে বললো যে ধোপা আমার কাপড় তখনও দিয়ে যায় নি। বেট প্রতিশ্রুতি দিয়েও প্রতিশ্রুতি রাখে নি। তাই খামকা আমার রাগ হয়ে গেলো। রেগে মেগে ট্যাক্সি করে এই ডাইঙ ক্লিনিং দোকানটাতে এসে দেখি, সেটা বন্ধ। একবার কোর্টে গিয়ে একজন বন্ধু উকিলের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে ছিল। এই জন্য দুর্ভাগ্যক্রমে এই ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে সেটাকেও ছেড়ে দিয়েছিলাম। তা' না হলে আমাদের মাইনে-করা ট্যাক্সি-ড্রাইভার নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করার জন্য ছুটে আসতো। এতোগুলি ঘটনার যোগাযোগ আপনার পক্ষে গিয়েছে বলে আপনি এবারের মত বেঁচে গেলেন। আপনার ওপর বাবা বৈদ্যনাথের বোধ হয় দয়া আছে। অবশ্য ভগবান বলে কোনও বস্তু বা ব্যক্তি যদি থাকেন তবে—'

রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে খোকার কাছ হতে এতো তত্ত্ব কথা শুনতে আমরা স্বভাবতই রাজি ছিলাম না। এদিকে সুরেশবাবু আমার উপদেশ মত থানা থেকে একটা হাতকড়া ও একটা মোটা রশি আনতে পাঠিয়ে ছিলেন। এর কারণ এই যে, ঝটকান মেরে এতোগুলো ব্যক্তির হাত এড়িয়ে পালাবার মত ক্ষমতা খোকাবাবুর ছিল। দ্রব্যকয়টি থানা থেকে এসে পড়া মাত্র আমরা খোকার হাতে হাতকড়া পরিয়ে ও কোমরে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি জড়িয়ে তার মত বীরের মর্যাদা রাখতে কুণ্ঠা বোধ করি নি। এর পর ধীরে ধীরে আমরা তাকে নিয়ে থানায় এসে দেখি যে সশস্ত্র শাস্ত্রীদল সহ S. D. O. সাহেব, রবীন্দ্রবাবু, ডি. এস. পি. বসিরুদ্দিন খান সাহেব প্রভৃতি থানায় এসে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে মধুপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ এস, ব্যানার্জিকেও দেখলাম। স্বাধীনতার পর ইনি বিহারের এ, আই, জি, হয়েছিলেন।

খোকাবাবু চারি দিকে একবার চেয়ে দেখে আমাকে বললো 'আরে পঞ্চাননবাবু! ভুল করছেন আপনি। আমি হচ্ছি ডুপ্লিকেট খাঁদা।

আমারই নাম হচ্ছে সুধীর। আসল খাঁদাকে ধরেও কোলকাতায় তাকে আপনারা ছেড়ে দিয়ে এসেছেন।' খোকাবাবুর কথায় চমকে উঠে আমি তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম। তারপর তার ক্রূর দৃষ্টির প্রতি চোখ রেখে আমি উত্তর করলাম, 'আচ্ছা! এখুনই তা প্রমাণ হবে। তোমার বন্ধু হরিপদও আমার সঙ্গে এসেছে।' হরিপদকে আনবার জন্য আমি থানায় এসেই একজন জমাদারকে পাঠিয়েছিলাম। আমার কথা শেষ হতে না হতে হরিপদ সেখানে উপস্থিত হয়ে বলে উঠলো, 'আরে, এই তো খাঁদা—খাঁদা—তাহলে খাঁদা ধরা পড়লো, এঁ্যা।' খাঁদা বজ্রমুষ্টি তুলে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তাতে অপারগ হয়ে চোখ দুটো ছোট করে বলে উঠলো, 'পঞ্চাননবাবু তার কর্তব্য করেছে। কিন্তু তোকে আমি ঘৃণা করি। তোকে আমি আগে সরাবো।' সকলে মিলে হরিপদবাবুকে তার পিছনে সরিয়ে দিয়ে আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় খোকাকে নিয়ে একটা লরিযোগে D. S. P. সাহেবের নেতৃত্বে সশস্ত্র পুলিশের একটা দল সহ খোকার বিনাসী টাউনের বাটীতে এসে তখুনি কয়েকজন স্থানীয় সাক্ষীর সমক্ষে বাটীর খানাতল্লাসী শুরু করে দিলাম। খাঁদার বাক্স খুলে তার মধ্যে আমরা প্রথমেই পেলাম তাজা কার্তুজ ভর্তি একটি পিস্তল। এই পিস্তলটি দুই বৎসর পূর্বে কুমারটুলির একটি জমিদার বাড়ি হতে সেখানকার তালা ভেঙে চুরি করা হয়েছিল। এর পর ঐ বাক্সের ভিতর হতে হাতির দাঁত দিয়ে বাঁট বাঁধানো খোকাবাবুর শৌখিন ক্ষুরধার ছুরিখানা বেরিয়ে পড়লো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে তখনও পর্যন্ত ছুরির ব্লেডে শুকনা রক্তের ছাপ লাগা ছিল। এছাড়া ঐ বাক্স হতে সতের হাজার টাকা ও এগারোটি হীরার অলঙ্কার পাওয়া গেল। এইখানকার বাটী হতে আরও কয়েকটি মূল্যবান প্রদর্শনী দ্রব্য (Exhibit) পাওয়া গিয়েছিল। এইগুলি ছিল খোকার পরিধেয় বস্ত্রাদি। এদের প্রত্যেকটির কোণে কোণে লাল

স্মৃতির দ্বারা S অক্ষরটি উৎকীর্ণ করা ছিল। এইরূপ ভাবে S অক্ষর যুক্ত বহু রক্তমাখা বস্ত্রাদি ইতিপূর্বে আমরা কৃপানাথ লেনের বাড়িতেও পেয়েছিলাম। এই থেকে আমরা প্রমাণ করতে পেরেছিলাম যে S অক্ষরযুক্ত রক্তমাখা কাপড়গুলির অধিকারী খোকাবাবুই ছিল।

এতে মহা উৎফুল্ল হয়ে আমরা খোকাবাবুকে নিয়ে দেওঘর থানায় ফিরলাম, কিন্তু খোকাবাবুর অনুগত ভৃত্য কালাপাহাড়কে কোথায়ও আর পাওয়া গেলো না। তবে স্থানীয় এক পানবিক্রেতা আমাদের জানালো যে এইদিনই সে খোকার আদেশে মধুপুরে একটা কাজে গিয়েছে। সেখানে সে দিন চার পাঁচ থাকবে। এর পর খোকাকে নিয়ে আমাদের অপর এক সমস্যা হলো। আমরা তাকে থানার হাজতে রাখা একটু-মাত্রও নিরাপদ মনে করি নি। এইজন্য S. D. O. সাহেবের বিশেষ আদেশে তাকে আমরা স্থানীয় জেলখানায় পাঠিয়ে দিলাম। এই সময় ঠিক হলো যে, তার বিবৃতি নেবার জন্য আমি পরদিন প্রত্যূষে খোকার সঙ্গে এই জেলখানায় এসে দেখা করবো। S. D. O. সাহেব এইজন্য একটি বিশেষ হুকুমনামাও আমার সুবিধের জন্য লিখে রাখলেন।

এইদিন কোনও রকমে একটু আহার করে হরিপদকে সান্ত্বনা দিতে দিতে আমি থানায় বড়বাবুর কোআর্টারের একটি ঘরে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এমন নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ ঘুমের আস্বাদ আমি বহুদিন পাই নি। কিন্তু কে জানতো যে বিপদ তখনও আমাদের শেষ হয়নি।

সকাল পাঁচটায় জানালা দিয়ে ভোরের আলো আসামাত্র আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এই বিদেশ বিভূঁই-এ এসে পরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। এ'ছাড়া এ'শহরে এই মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকটি তদন্তের কার্য আশু সমাধা করার প্রয়োজন। আমার ইচ্ছা হলো এখুনি উঠে পড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও আমি বিছানা হতে

উঠতে পারছিলাম না, বরং আবার আমার ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছিল। ইতিমধ্যে হরিপদ কখন উঠে বাইরে রকের উপর পায়চারি করছিল। এই সময় সে ঘরে এসে বাকি জানালা খুলে দিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। হরিপদবাবু বোধ হয় বলতে চাইছিল, 'এবার উঠে পড়ুন, স্যার', কিন্তু তা আর তার বলা হলো না। সে এইবার আঁতকে উঠে বলে উঠলো, 'আপনার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে যে স্যার!' হরিপদর মুখে এই কথা শুনা মাত্র আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু উঠবার চেষ্টা করা মাত্র আমি বুকের পাঁজরার উপর অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করলাম। এর পর হরিপদবাবু আর দেরি না করে ছুটে গিয়ে অফিসার-ইন-চার্জ সুরেশবাবুকে ডেকে নিয়ে এলো। আমার এইরূপে অসুস্থ হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্র সুরেশবাবু ও তার সহকারী একজন বিহারী অফিসার যশোয়ালবাবু তক্ষুনি সেখানে ছুটে এলেন। এর একটু পরে যশোয়ালবাবু একজন ডাক্তারও ডেকে এনেছিলেন। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে বললেন যে, পাঁজরার কোনও ফ্র্যাকচার হয়নি। আমার শুধু নাকের উপরই আঘাত লেগেছে। যশোয়ালবাবুর পুরা নাম আমার মনে নেই, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর নাম আমার মনে আছে। তাঁকে বালিকা বললেই চলে। নাম তাঁর ছিল পুতুল। এতো ভগিনী-প্রতিম স্নেহ-যত্ন এখানে এসে পাবো তা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা হতে সেবা-শুশ্রূষার প্রতিটি কার্য তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে যথেষ্ট করেছিলেন। তাঁরা আজ কোথায় আছেন জানি না। কিন্তু আজও তাঁদের আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। সৌভাগ্যক্রমে ধ্বস্তাধ্বস্তির সময় খোকাবাবুর পদাঘাত আমার নাকটাই মাত্র জখম করেছিল। যশোয়াল-বাবু ও তাঁর স্ত্রীর মানা সত্ত্বেও আমি বিকালের দিকে লোকাল সার্জেলে গিয়ে খোকাবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। খোকাবাবু আমাকে

দেখা মাত্র উঠে পড়ে আমাকে অভিবাদন করে জিজ্ঞেস করলো, 'নাকটায় ব্যাণ্ডেজ কেন? লেগেছিলো নাকি? তা' ও কিছু নয়। জানে তো বেঁচে গেছেন।'

জানে আমি যে বেঁচে গিয়েছিলাম তা সত্য কথা। কিন্তু তার জন্যে খোকাকে ধন্যবাদ জানাতে আমার মন চাইল না। আমাদের দেশের এই এক নম্বরের পাবলিক এনিমির এইরূপ আপত্তিকর প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে তাকে আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তুমি পাগলা-বাবুকে খুন করেছিলে?'

খোকাবাবু আমার এই প্রশ্নে প্রথমে হো হো করে হেসে উঠলো। তার পর আমার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে উত্তর করলো, 'আমরা দুজনায় কেউ কচি খোকাটি নই। তাই এসব প্রশ্ন আমি অবান্তর মনে করি। সরকারী ভাবে আমি একথা নিশ্চয়ই অস্বীকার করবো। কিন্তু বেসরকারী ভাবে জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো যে তাকে আমিই খুন করেছি। পাগলাকে খুন করা ভিন্ন আমার অন্য কোনও উপায়ও ছিল না। সে আমার মনের শান্তি অপহরণ তো করেই ছিল, এমন কি সে আমার মলিনাকেও সরিয়ে নিতে চেয়েছিল। পুলিশ আমাদের হন্যে কুকুরের মত এক পাড়া থেকে অপর পাড়ায় তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। আমরা না পেরেছি একটু খেতে, না পেরেছি একটু ফুর্তি করতে। এজন্য একমাত্র দায়ী ছিল ঐ পাগলা। এই পৃথিবী কেবলমাত্র শক্তিমানদেরই উপভোগ্য। এই জন্যে আমরা পাগলাকে ইহলোক হতে সরিয়ে দিলাম। সুবিধে পেলে আপনাকেও আমি পরলোকে পাঠাতাম। অন্যথায় পাগলা বা আপনি যদি আমাকে এ পৃথিবী হতে সরিয়ে দিতে পারতেন তা'হলেও তাতে আমার ক্ষোভ হতো না। যাই হোক, আমি স্বীকার করবো যে বুদ্ধির ও শক্তির লড়াইতে আমি আজ আপনার কাছে হেরে গেছি। তবে যদি কোনক্রমে

আদালতের বিচারে আমি মুক্তি পাই, তাহলে আর একবার দেখা যাবে।'

খোকার বিরুদ্ধে অনেকগুলি খুনের, তালা ভেঙে চুরির ও রাহাজানির অভিযোগ ছিল। কিন্তু আমরা জানতাম যে এখুনি এই সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসা করলে কোনও সদুত্তর পাওয়া যাবে না। তার কাছে মামলার সহিত সম্পর্ক রহিত কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করে তাকে কিছুটা বিভ্রান্ত করে আসল কথাটা পাড়লে সুফল পেলেও পাওয়া যেতে পারে। এইজন্য বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তাকে প্রভাবান্বিত করে আমি তার নিকট হতে একটি বিবৃতি আদায় করতে মনস্থ করলাম। আমি এই সময় তাকে পর পর অনেকগুলি প্রশ্ন করেছিলাম। সে কখনও শান্তভাবে, কখনও উত্তেজিত হয়ে সেইগুলির উত্তরও দিয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, তার কাছ হতে কথা বার করবার জন্য আমি প্রয়োজন মত সুপরিকল্পিত ভাবে তাকে উত্তেজিত করেছিলাম। এর কারণ এই যে আমি ভালো করেই জানতাম যে তখনও পর্যন্ত সে খুনের নেশায় ভরপুর। তাই সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠলে সে বহু বাহাদুরীসূচক কাহিনীর অবতারণা করলেও করতে পারে। এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো।

প্রঃ।—আচ্ছা! তুই যে ঐ রকম একটা জলজ্যান্ত মানুষকে এমনি নির্মমভাবে খুন করলি, এতে কি তোর একটুও দুঃখ হচ্ছে না?

উঃ।—কেন দুঃখ হবে মশাই! আপনারা যখন একটা বেড়াল বা ইঁদুর মারেন তখন কি তাদের জন্য আপনাদের একটুও দুঃখ হয়? এরা কি আপনাদের মত দুই বা চার পা-ওয়ালা জীব নয়? এই সব ইঁদুরদের মত পাগলাও আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিল, তাই তাকে আমায় সরিয়ে দিতে হয়েছে। আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি যে

এই পৃথিবীতে বাঁচবার অধিকার শুধু শক্তিমানদেরই আছে। তাছাড়া এই পাগলাকে তো আমি অকারণে মারিনি?

প্রঃ।—এ তো তুই আমাদের এই ইহলোকের কথা বললি। কিন্তু পরলোকে তোর কি হবে সে সম্বন্ধে কি তুই কিছু ভেবেছিস? এখানকার শাস্তি এড়াতে পারলেও সেখানকার শাস্তি তুই এড়াতে পারবি না।

উঃ।—আপনারা কি রকম লেখাপড়া শিখেছেন তা জানি না। আমার মতে পৃথিবীতে তিনটি জিনিস হচ্ছে একেবারেই অমূলক। এই তিনটি পদার্থের নাম হচ্ছে ভূত, ভগবান আর প্রেম। আবহমান কাল ধরে লোকে বলে আসছে যে এই তিনটি জিনিসের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু কোন দিনই কেউ এর চাক্ষুষ প্রমাণ পায়নি। আমার মতে লাইফটা হচ্ছে একটা মোটরকার। এ-পারেও কিছু নেই, ও-পারেও কিছু নেই। পেট্রোল ফুরিয়ে গেলেই তা থেমে যাবে। এর জন্য ভয় পাবার কি আছে, তা তো আমি বুঝি না। তবে প্রেমটায় আমি হঠাৎ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সে বিশ্বাসও এবার আমার ভেঙে গিয়েছে। তাই পাগলার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে আমি সেটা মলিনাকে দেখিয়ে বলে এসেছিলাম, 'কি রে শালী! আর কাউকে ভালবাসবি?' হতভাগী সে কথা বোধ হয় আপনাদের বলেনি?

প্রঃ।—এসব না হয় আমি বুঝলাম। কিন্তু তোর কি প্রাণের ভয়ও নেই? এমন সুন্দর পৃথিবীতে তোর কি আরও কিছু দিন বাঁচতে ইচ্ছে হয় না? ভালো করে ভেবে দেখ আমি এই ব্যাপারে তোর জন্যে কিছু করতে পারি কি না?

উঃ।—আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাতে ক্ষতি নেই। আমি কিন্তু সত্য কথা বলছি, সত্যই আমার মরতে ভয় নেই। এর কারণ এই যে, আমি আমার জীবনটা পুরাপুরি ভাবে ভোগ করেছি।

আমি আমার লাইফের ইঞ্চি বাই ইঞ্চি ভোগ করে নিয়েছি। জীবনের প্রতি মুহূর্ত আমার ইচ্ছামত ভোগে লাগিয়েছি। তাই আজ আমার কোনও অনুশোচনা নেই। আমি মরবো আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের সঙ্গে মিশিয়ে যাবো। অবশ্য ভগবান বলে কোনও ব্যক্তি বা বস্তু যদি থাকে, তবে। আমরা হচ্ছি জীবনধর্মী, তাই মরতে আমাদের ভয় নেই। কিন্তু আপনারা যখন মরবেন তখন চিমড়ে খেয়ে খেয়ে মরবেন। আপনাদের তখন মনে হবে যে এটা করতে পারতাম, ওটাও করতে পারতাম। কিন্তু হায়, কোনটাই তো আমাদের করা হলো না। আর সেই সব করা হলো না শুধু রাষ্ট্র ও সমাজের ভয়ে।

প্রঃ।—কিন্তু সত্যই কি তোর জীবনে আজ কোনও অভাব বা ক্ষোভ নেই? ক্ষোভ বা অভাবহীন জীবন তো আমি কল্পনাও করতে পারি না। এমন একটি নিরঙ্কুশ জীবনের অধিকারী হলে তোর এই সব খুন, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি অপরাধ করার কোনও দরকারই হতো না। একটু ভেবে দেখে বলত দেখি আমাকে তোর ঠিক ঠিক মনের কথা?

উঃ।—আপনারা যাকে অন্যায় মনে করেন, আমি তাকে অন্যায় মনে করি না। তবু মনে হত জীবনে মাত্র একটি অন্যায় আমি করেছি। আমি চন্দ্রনগরে একটা বিয়ে করে ফেলেছি। মাঝে মাঝে আমি কি রকম অসুস্থ হয়ে পড়ি। এই সব খুন-ডাকাতি আমার ভালো তো লাগেই না, এমন কি আমার লোকেদেরও তখন আমি বরদাস্ত করতে পারি না, আমি তখন ভদ্রভাবে ভদ্রলোকদের সঙ্গ কামনা করে তাদের সঙ্গেই বসবাস করি। এমনি এক আমার দুর্বল মুহূর্তে চন্দ্রনগরে এসে আমি একটা বিয়ে করে ফেলি। তবে তাকে আমি হাজার পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এসেছি। আর তাকে আমি বলে এসেছি যে আমার মৃত্যু হলে সে যেন আমার মত এন্তার ফুর্তি করে। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, সে হিন্দু বিধবা নারীদের ন্যায় তুলসীপাতার রস

দিয়ে নিরামিষ খাবে। কিংবা সে বারমাসে বার-ব্রত ও উপবাস করে মরবে। যদি সে তা না করে তাহলে আমার আত্মা স্বর্গে চলে যাবে। কিন্তু সে যদি তা করে তাহলে আমার আত্মা একটুক্ষণও শান্তি পাবে না।

খোকাবাবুর এই পরস্পরবিরোধী মতবাদ শুনে মনে হলো যে অপরাধদর্শন সত্যই কোনও স্থায়ী দর্শন নয়। উহা অপরাধীদের বিকৃত মনের পরিচয় দেয় মাত্র। আমি এই খোকাবাবুকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ এই সময় আত্মস্থ হয়ে সে বলে উঠলো, 'বাজে কথা বলে অনেক কিছুই তো জেনে নিলেন দেখছি। আর কিন্তু আমি কোনও কথাই আপনাকে বলবো না। তবে সার কথা এই জেনে রাখুন যে চোরেরা মরে মেয়েদের ভালোবেসে। আর মেয়েরা মরে চোরেদের বিশ্বাস করে।'

খোকাবাবুর এই সকল প্রলাপোক্তি শোনবার যথেষ্ট সময় এই দিন আমার ছিল না। এ ছাড়া এর এই সব কথাগুলো আমার মনে বিশেষ আগ্রহও সৃষ্টি করতে পারে নি। এর কারণ আমার শরীর ও মন এই দিন ভালো ছিল না। একটা নিদারুণ অবসাদ যেন আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মাসের পর মাস একটা নিদারুণ উত্তেজনার মধ্যে সময় অতিবাহিত করেছি। হঠাৎ এই সংঘাতিক উত্তেজনা হতে রেহাই পাওয়ায় আমরা যেন ভেঙে পড়েছিলাম। দ্রুতগতি যন্ত্রশকট হঠাৎ ব্রেক কষে থেমে গেলে তার কলকব্জার যা অবস্থা হয়, ঠিক তেমনি আমাদেরও দেহ ও মন একটা বিরাট ঝাকুনি খেয়ে যেন থেমে যেতে চাইছে। তাই এইখানে আর দেরি না করে আমি দেওঘর থানায় ফিরে যেতে মনস্থ করলাম। ঠিক সেই সময় একজন বাঙালী অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন সেই শহরের একজন অ্যাংলো ঊর্ধ্বতন অফিসার। হিন্দি ভাষায় তিনি খোকাকে

জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখো! টোমরা পাশ আউর পিস্তল উস্‌কা হ্যায়?' খোকাবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই উর্ধ্বতন অফিসারটির দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে উত্তর করলো, 'আমি সব কথাই আপনাদের কাছে স্বীকার করবো। একটা পিস্তল মাত্র আপনারা আমার ঘরে পেয়েছেন। কিন্তু আরও দশ বারোটা পিস্তল, এক বাক্স টোটা ও এগারোটি তাজা বোমা আমি চিত্রকুট পাহাড়ের একস্থানে পুতে রেখেছি। এখুনি আপনারা সেখানে না গেলে আমার দলের লোকেরা সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে যাবে।' খোকাবাবুর মুখের এই স্বীকৃতি শুনে উপরোক্ত উর্ধ্বতন অফিসারটি একবারে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে চীৎকার করে তাঁর সঙ্গের অফিসারটিকে বললেন, 'ওহে এখুনি তুমি থানায় গিয়ে দু' ট্রাক্ সশস্ত্র সিপাহী প্রস্তুত করো। আর এখান ওখান হতে আরও দশ বারো জন অফিসার আনিয়ে নাও। আমাদের এই খুনে আসামীকে নিয়ে এখুনি চিত্রকূট পাহাড়ে যেতে হবে।'

এদের এই সব ব্যাপার দেখে আমি এক রকম হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। এখানকার পুলিশদের কর্তব্য কার্য সম্বন্ধে আমার পক্ষে কোনও উপদেশ দেওয়া সাজে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে এই সম্বন্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ জানাতে হলো। এর কারণ, আমি ভাল রূপেই বুঝেছিলাম যে, খোকাবাবুর পুলিশ হেপাজতি হতে অতর্কিতে পলায়ন করবার এ এক সুপরিকল্পিত ফন্দি ছাড়া অপর আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে খোকাবাবু পুলিশকে ভাঁওতা দিয়ে একবার চিত্রকুট পাহাড়ে পৌছুতে পারলে সে তার স্বভাবসুলভ রুদ্র-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করতো। এইরূপ অবস্থায় বহু পুলিশ ও শাস্ত্রী পরিবেষ্টিত হয়েও সে মাত্র একটি উল্লম্ফন দ্বারা পলায়নে সমর্থ হতো। আমি প্রকৃত বিষয়টি ওখানকার ঐ উর্ধ্বতন অফিসারটিকে ইংরাজিতে বুঝিয়ে দেওয়া মাত্র খোকাবাবু বুঝেছিল যে, তার এই সব ফন্দি-ফিকির

আর কাজে লাগলো না। সে এইবার একটু শ্লেষের হাসি হেসে নিষে সেই বাঙালী অফিসারটিকে সম্বোধন করে বলে উঠলো, 'আরে, ইনি কি আপনাদের ডি-এস-পি নাকি? কোলকাতার হিন্দুস্থানী জমাদাররাও এঁর চেয়ে চালাক।' খোকাবাবু বাঙলায় কি বললো, তা বুঝতে না পেরে ঐ সাহেবটি আমাদের তা ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু আমরা কেউই খোকাবাবুর বক্তব্যটুকুর সারমর্ম তাঁকে জানাতে পারিনি। খোকাবাবু এইবার আমার দিকে চেয়ে মুখ ভেঙচে বলে উঠলো, 'বড় বেয়াড়া সময়ে এসে পড়ে আপনি সব মাটি করলেন। এখন আমি দেখছি যে ভগবান বলে জনৈক দূরদর্শী ব্যক্তি তাহলে সত্যই আছে। তা না হলে বারে বারে আমার প্রতিটি পরিকল্পনা এমনি করে আশ্চর্যজনক ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবেই বা কেন? কিন্তু আমার কমাণ্ডার-ইন-চিফ কালাপাহাড়ের সন্ধানে মধুপুরে গেলে কিন্তু আপনার নির্ঘাত মৃত্যু।'

পরের দিন সকালে আমি ওখানকার মহকুমা হাকিম, পুলিশ সাহেব ও ডেপুটি পুলিশ সাহেবের সহিত এক পরামর্শসভায় মিলিত হলাম। আমি তাঁদের কাছে খোকাকে সশস্ত্র পুলিশের পাহারাধীনে কোলকাতায় পাঠিয়ে দেবার জন্য একটি লিখিত আবেদনও করেছিলাম। কিন্তু এদিকে খোকাকে তখুনি কোলকাতায় নিয়ে যাবার একটি আইনগত বাধারও সৃষ্টি হলো। খোকার দেওঘরের ডেরাতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত একটি টোটা-ভরা পিস্তলও পাওয়া গিয়েছিল। এইজন্য বে-আইনি ভাবে বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার জন্য ভারতীয় অস্ত্র আইন অনুযায়ী দেওঘর থানায় এঁরা এই সম্পর্কে একটা পৃথক মামলাও রুজু করে দিয়েছিলেন। এই জন্য তাকে এখানকার এই মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোলকাতায় পাঠানো চলে না। পরের দিন আদালতে

উপস্থিত হয়ে খোকাবাবু এই সব সমস্যা ইচ্ছা করেই আর জটিলতর করে তুললো। এই আগ্নেয়াস্ত্রটির হেপাজতি স্বীকার করে নিয়ে সে ইচ্ছা করেই এক বৎসরের জন্য কারাবরণ করে সেখানকার জেলে চলে গেল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে এই সুযোগে কোলকাতার খুনের মামলাটির শুনানি সে দেরি করিয়ে দিতে চায়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে তার বিশ্বস্ত অনুচরদের দ্বারা ভয় দেখিয়ে আমাদের সংগৃহীত সাক্ষী সাবুতদের কোলকাতা শহর হতে ভাগিয়ে দেওয়া। অন্য প্রদেশের কোনও জেল হতে আসামীকে অপর প্রদেশের আদালতে আনা নিম্ন আদালতের এক্তিয়ারের বাহিরে ছিল। একমাত্র কোলকাতা হাইকোর্ট বিহার হাইকোর্টের মাধ্যমে এইরূপ আসামীকে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের নিম্ন আদালতে বিচারের জন্য আনিয়ে নিতে সক্ষম ছিল। এইরূপ অবস্থায় মামলা কোলকাতার ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিটের আদালতে পাঠিয়ে সেখানে খোকাকে আনয়নের জন্য কোলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। অগত্যা নাচার হয়ে আমরা এইবার খোকার এখানকার সেকেণ্ড-ইন্ কমাণ্ড কালাপাহাড়ের সন্ধানে মধুপুর যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম।

কালাপাহাড়কেও আমাদের অকৃত্রিম সাইদী বন্ধু হরিপদবাবু ভালোরূপেই চিনতো। কলিকাতার স্থানীয় কুস্তী ক্লাবগুলিতে কজন পালোয়ান বলে তার নাম-ডাক ছিল। তবে আমাদের এই কালাপাহাড় কলিকাতার সেই কালাপাহাড় কি না, তাতে আমার সন্দেহ ছিল। দেওঘরে আমাদের অগণিত নূতন বন্ধুদের নিকট বিদায় নিয়ে মধুপুরে যাবার জন্য স্টেশনের দিকে যাচ্ছি, এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন মধুপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ এস, রায়। তিনি পরে বিহার গভর্নমেণ্টের এ, আই, জির পদে উন্নীত হতে পেরেছিলেন। তিনি আমাদের তাঁর

গৃহ অতিথি হবার জন্যে নিমন্ত্রণ করলেন। এ ছাড়া তিনি সর্বতোভাবে আমাদের এই কালাপাহাড়কে গ্রেপ্তার করতে আমাদের সাহায্য করবার জন্যে প্রতিশ্রুতি দিলেন। শ্রী এস, রায় দেওঘর কোর্টে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন। এই জন্য তাঁর অগ্রহাতিশয্যে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমরা তাঁর সঙ্গে রাত আটটার গাড়িতে মধুপুর রওনা হয়ে গেলাম। আমরা গালগল্প করতে করতে মধুপুর থানার নিকট বড় রাস্তার উপর এসেছি, এমন সময় হরিপদ এক ব্যক্তির দিকে আঙুল নির্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলো, 'অ-ওই তো কালাপাহাড়।' আমরা সচকিত হয়ে চেয়ে দেখলাম, মসীবর্ণ, স্থূলকায় ও দীর্ঘদেহী, কাপড় ও ফতুয়া পরা এক ব্যক্তি, আমাদের দেখা মাত্র পথের পাশ হতে একটা বড় পাথর কুড়িয়ে নিয়ে আমাদের দিকে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছিল। কিন্তু এই সময় আমরা আরও জোরে চীৎকার করা মাত্র সে বিরাট বৃক্ষের সারির পিছনে ত্বরিত গতিতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। এই সময় সেখানে দাশুবাবু নামে এক শক্তিমান স্থানীয় বাঙ্গালী প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। এই মহা সাহসী ভদ্রলোকের সহিত রায় বাবুর বিশেষ পরিচয় ছিল। আমরা চারজনে মিলে কালাপাহাড়ের জন্য এদিক ওদিক বহু খোঁজাখুঁজি করলাম। কিন্তু কোথাও আর একটুখানির জন্য তাকে আমরা দেখতে পেলাম না। প্রায় চার-পাঁচ দিন তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য আমরা মধুপুরে ছিলাম। কিন্তু কোথায়ও তাকে আমরা আর দেখতে পাইনি। এর পর আর এখানে কালবিলম্ব না করে আমরা কলিকাতায় রওনা হয়ে গেলাম। কলিকাতায় পৌঁছে প্রায় সন্ধ্যার দিকে আমরা থানায় এসে দেখলাম যে, সেখানে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য যে, দেওঘর ত্যাগ করার পূর্বে আমরা ইনস্পেক্টার সুনীল

রায়কে একটা টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলাম—"খোকা এরেস্‌টেড্‌—নো ক্যাসুয়েলটি"। এ ছাড়া মধুপুর থেকেও আমরা কোলকাতায় রওনা হলাম বলে একটা তার পাঠিয়েছিলাম। থানায় ঢুকে বিস্মিত হয়ে দেখলাম যে, সেখানে আমাদের অভিনন্দন জানাবার জন্য বহু নাগরিক অপেক্ষা করছেন। এঁদের মধ্যে কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়, নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য, ৺কর্মযোগী রায়, ৺উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীও ছিলেন। এঁরা আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং থানার সন্নিকটে বাস করতেন। এ ছাড়া শ্রীসজনীকান্ত দাস, ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য এবং ৺ভবতোষ ঘটক টেলিফোনে আমাকে এ সম্বন্ধে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। রাত্রের দিকে অন্যান্য নাগরিকদের সহিত বহু রূপজীবিনীও বিভিন্ন স্থান হতে থানায় এসে খোকাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে আমাদের ধন্যবাদ দিয়ে গিয়েছিল। তাদের সকলেরই মুখে সেই একই কথা—এক নম্বরের পাবলিক এনিমি তাহলে এতো দিনে ধরা পড়লো। এদের কেউ কেউ আমাদের সান্ধ্য ভোজে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়িতও করেছিল। কিন্তু এতো অভিনন্দন ও নিমন্ত্রণ সত্বেও সব ভুলে আবার আমাদের খুনের তদন্তে আত্মনিয়োগ করতে হলো। এই সময় ডাইরির পাতাগুলি ঘেঁটে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, এখনও তদন্তের ব্যাপারে অনেক খুঁটিনাটি কাজ বাকি। আমাদের অবর্তমানে ইনস্‌পেক্টার সুনীল বাবু কয়েকজন দরিদ্র বিধবা ও অনুরূপ কয়েকটি দুঃস্থ ভদ্র পরিবারকে খুঁজে বার করেছিলেন। খোকাবাবু এই সব দরিদ্র পরিবারগুলিকে মধ্যে মধ্যে নিঃস্বার্থ ভাবে আর্থিক সাহায্য করেছিল। এদের কারুর কারুর কন্যার বিবাহে খোকাবাবু নগদ টাকা ও বহু অলঙ্কার যৌতুক দিয়েছিল। তিনি ইতিমধ্যেই ঐ সকল গহনা চোরাই গহনা বলে সন্দেহ করে আটক করেছেন। এ ছাড়া খোকাবাবুর

কৃপানাথ লেনের বাড়িতে ও তার দেওঘরের ডেরা তল্লাস করে বহু অলঙ্কার পাওয়া গিয়েছে। এক্ষণে আমাদের প্রধান কর্তব্য হলো, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সিঁদেল চুরির নথি-পত্র হতে ঐ সকল চুরির ফরিয়াদিদের খুঁজে বাহির করা এবং ঐ সকল চোরাই গহনার মালিকদের দ্বারা সেইগুলি সনাক্ত করানো। এই জন্য আমাদের থানার জুনিয়ার অফিসারদের রুমের কয়েকটি টেবিল একত্রিত করে তার উপর এই সকল গহনাগুলি পর পর সাজিয়ে রেখে আমরা একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলাম। সকাল-সন্ধ্যায় বহু মামলার ফরিয়াদিরা একে একে এইগুলি ভালো করে দেখে তাঁদের আপন আপন দ্রব্য ব'লে সনাক্ত করে গেলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেরামতির দাগ সহ ওজন, প্যাটার্ন ইত্যাদি হতে তাঁরা এইরূপ সনাক্তি-করণের কার্য সমাধা করতে পেরেছিলেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে স্যাকরারা এসে উহাদের কয়েকটি গহনা নিজেদের তৈরি বলে দাবী করে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য যে, এক এক জনের কাজের এক এক রকম বৈশিষ্ট্য থাকে। সাধারণ মানুষের চক্ষে এই সকল সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরা না পড়লেও কারিগরদের হাতে তা অতি সহজেই ধরা পড়ে। এ ছাড়া এমন অনেক খিঁচখাঁচ এখানে ওখানে থাকে, যা থেকে ব্যবহারকারীরা নিজের নিজের দ্রব্য সহজেই চিনে নিতে পারে। এ ছাড়া কয়েকটি গোল্ড-ক্যাপড্ ফাউণ্টেন পেনের জন্য আমরা একটি অভিনব দ্রব্য-সনাক্তি করণেরও ব্যবস্থা করেছিলাম। চোরাই দুইটি ফাউনটেন পেনের সহিত হুবহু অনুরূপ সাত-আটটি কলম বার হতে এনে সেগুলির সহিত একত্রে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে আমরা চোরাই ফাউনটেন পেনের মালিকদের তাদের আপন আপন কলম অতগুলো অনুরূপ কলমের মধ্য হতে বেছে নিতে বলি। আশ্চর্যের বিষয়, তারা তাদের নিজেদের কলম দুইটি

অতগুলো কলমের মধ্যে হতে অতি সহজেই বেছে নিতে পেরেছিল! এই ভাবে সনাক্ত করণের দ্বারা সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে আমরা পঁচাত্তরটি সিঁদেল চুরির মামলাও খোকাবাবুর বিরুদ্ধে রুজু ক'রে দিয়েছিলাম। এই কয়টি মামলা ছাড়া পাগলা হত্যা মামলা এবং শিউচরণ হত্যা মামলা সম্পর্কেও আমাদের তাকে কলকাতায় আনার প্রয়োজন হয়েছিল। এই জন্য নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালতের মারফত বিহার হাইকোর্টের মাধ্যমে খোকাকে কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করে আমি কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আসামী কেষ্টর সঙ্গে দেখা করবার জন্য অনুমতি চাইলাম। চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ক্রমে জেলে আসামীর সঙ্গে দেখা করে বুঝলাম যে, সে এখন ভিন্ন প্রকারের মানুষ হয়ে গিয়েছে। জেল-হাজতে বসেই সে খোকার গ্রেপ্তারের বার্তা পেয়ে গিয়েছিল। আমার নিকট এই সময় সে পূর্বাপর সকল তথ্য প্রকাশ করে কুমারটুলি অঞ্চলের যে সরু গলিটার দেওয়ালের খাঁজে খোকার পরিত্যক্ত যে দুইটি দ্রব্য (১) রক্তমাখা জুতা ও (২) রুমাল খোকা গুঁজে রেখেছিল, সেই স্থানটি সে আমাকে এইবার দেখিয়ে দিতে রাজি হলো। আমি পরদিন তাকে কলকাতা শহরের প্রধান হাকিমের অনুমতি ক্রমে পুলিশ-হেপাজতিতে নিয়ে সেইখানে এলে সে খুশি মনেই সেইখানকার ভাঙা দেওয়ালের ভিতরকার একটি গহ্বর হতে খোকার রক্তমাখা জুতা দুইটি দুইজন স্থানীয় সাক্ষীর সম্মুখে বার করে দিয়েছিল। পাগলার দেহ হতে কাটা মুণ্ডটা গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসবার সময় তার পায়ের এই জুতো দুটো রক্তে ভিজে যায়। এইজন্য খোকা ওদুটো ঐ দেওয়ালের গর্তের মধ্যে গুঁজে রেখে শুধু পায়ে তার কৃপানাথ লেনের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। যাই হোক, কেষ্টর এই শেষ বিবৃতি অনুযায়ী

আমরা এই জুতা দুটি সরকারী রক্তপরীক্ষকের নিকট পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এই সম্পর্কে রক্ত পরীক্ষকের মন্তব্যের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলাম :—

"জুতা দুইটির উপর রক্ত পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বহুদিনের ব্যবধানে উহাদের কণিকাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, উহা মনুষ্য রক্ত কিনা তা সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়।"

এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, উপরোক্ত মন্তব্যে রক্ত-পরীক্ষক উহা যে মনুষ্যরক্ত নয়, তা'ও বলেননি। এই জন্য পারিবেশগত প্রমাণের ক্ষেত্রে উহার মূল্য ছিল অসামান্য। তবে এই জুতা দুইটি যে খোকার, তা সর্বাগ্রে আমাদের প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে, আমরা দেওঘরে খোকার পা হ'তে তার জুতা জোড়াটি গ্রহণ করতে ভুলে গিযেছিলাম। তা না হলে উভয় জুতা তুলনা করে প্রমাণ করা যেতো যে, উভয় জুতা জোড়াই খোকার। রক্তমাখা জুতাটি কেটে ওদের শুখতলার উপর হতে খোকার পাযের ছাপ হয়তো সংগ্রহ করা যেতো। কিন্তু সুনীলবাবু এইভাবে জুতাটি নষ্ট করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে আদালত-কক্ষে জুরীদের সামনে খোকার পাযে তার ঐ জুতা পরিযে তা তার পায়ে ফিট্ করিয়ে দিযে প্রমাণ করা যাবে যে ঐ দুটো খোকারই জুতো। এদিকে কেষ্ট আসামী বিধায় তাকে এ বিষয়ে সাক্ষীরূপে ডাকা যাবে না। নানাদিক বিবেচনা করে আমরা জুতো জোড়াটা খোকার দয়িতা মলিনা সুন্দরীকে একবার দেখানো উচিত মনে করলাম। তাহাকে এই জুতা জোড়াটা দেখানোর পর সে এই সম্বন্ধে একটি নূতন বিবৃতি দিয়েছিল। এই বিবৃতিটি উল্লেখযোগ্য বিধায় নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"কিছুকাল আগে নানা অপরাধ ও খুনখারাপি করার জন্য খোকার মনে একটু অনুতাপ এসেছিল। সে প্রায়ই অভিযোগ করে বলতো যে, তার আর কিছুই ভালো লাগছে না। এর পর একদিন সে আমাকে নিয়ে পুরীর জগন্নাথধামে কয়েকদিন কাটিয়ে আসবার জন্য প্রস্তাব করেছিল। আমি এতে মত দিলে সে আমাকে নিয়ে পুরী শহরের সমুদ্রধারে বাসাভাড়া করে কয়েকদিন বসবাস করে। এই সময় ঐ শহরের একটি জুতার দোকানে পায়ের মাপ দিয়ে সে ঐ জুতা জোড়াটি তৈরি করিয়ে নিয়েছিল। বহুদিন সে এই জুতা জোড়া পরে আমার বাড়িতে এসেছে। এইজন্য এই জুতা জোড়াটি খোকার ব'লে আমি নিঃসন্দেহরূপে সনাক্ত করতে পারছি।"

মলিনার এই বিবৃতি অনুযায়ী সেইদিনই মলিনা প্রদত্ত ঠিকানা ও ঐ জুতাসহ আমরা একজন অফিসারকে পুরী শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের সেই অফিসারটি পুরীতে সেই দোকানদারকে খুঁজে বার করে তাকে এ জুতা জোড়াটি দেখানো মাত্র সে উহা তার নিজের তৈরি ব'লে সনাক্ত করেছিল। এছাড়া তার দোকানের অর্ডার-বই হ'তে তারিখ সহ প্রমাণ করতে পেরেছিল যে, খোকা ঐ দিনে তার পায়ের মাপ দিয়ে ঐ জুতা তৈরি করার জন্য তাকে অর্ডার দিয়েছিল। এরপর যে বাড়িটা খোকা সেখানে ভাড়া নিয়েছিল, তার বাড়িওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করে আমাদের অফিসার বুঝতে পেরেছিল যে, খোকা সত্য সত্যই ঐ সময় কয়দিন পুরীতে কাটিয়ে গিয়েছে।

এরপর আরও কয়েকদিন সাক্ষ্যপ্রমাণের জন্য এখানে ওখানে ঘুরাঘুরি করার পর আমরা এই হত্যা মামলার ডাইরির পাতা খুলে আসামী কেষ্ট বাবুর পূর্বতন বিবৃতিটি পুনর্বার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

পড়ে দেখলাম। এই বিবৃতিতে কেষ্ট বলেছিল যে, পাগলাকে ট্যাক্সিতে করে ধরে নিয়ে যাবার সময় সে গরানহাটার মন্দিরের সামনে চেঁচিয়ে উঠে। এই সময় সত্য গোয়ালা ও হারু গোঁসাই নামক দুই ব্যক্তি তাদের দিকে ছুটে এসে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। এ ছাড়া সে আরও বলেছিল যে, তারা যখন পাগলাকে নিয়ে গঙ্গার ধার দিয়ে এগিয়ে আসছিল, তখন গৌরীয়া নামে এক পুরানো চোর চোরাইমালের আশায় তাদের সঙ্গ নিয়ে পরে সে তাদের সেইদিনকার সেই অভিযানের মধ্যে খুনের ব্যাপার আছে বুঝে বেমালুম সরে পড়ে। গৌরীয়ার এই অপরাধের জন্য খোকা কয়েকদিন বাদে শেওড়াফুলিতে গৌরীয়ার রক্ষিতার বাড়িতে এসে তাকে মারধোর করে এসেছিল। এ ছাড়া কেষ্ট এই কথাও বলেছিল যে, খোকা কাটা মুণ্ডটা জলে ফেলে উপরে উঠবার সময় তার সঙ্গে তার পিতার বন্ধু সন্ন্যাসী ঠাকুরের দেখা হয়েছিল। এই সময় তিনি একটি কুকুর সঙ্গে করে গঙ্গার ঘাটের সোপানে বসে হাওয়া খাচ্ছিলেন। খোকাকে কি একটা বস্তু জলে ফেলে দিতে দেখে তিনি সেই সম্বন্ধে খোকাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। খোকা তাঁর প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল যে, সে সেখানে একটা মরা বেড়াল ফেলে দিয়েছে। এরপর কেষ্ট বাবু আরও বলেছিল যে, জামা-কাপড় ছাড়বার পর কৃপানাথ লেনের বাড়ি থেকে বার হয়ে আসবার সময় তাদের বন্ধু দেবেন বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। এই সময়ে দেবেন বাবু খোকাদের বাটীর রোয়াকে বসে হাওয়া খাচ্ছিল।

আমরা এর পর এই কেষ্টর বিবৃতি অনুযায়ী প্রতিটি সাক্ষীকে খুঁজে বার করে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছিলাম যে, কেষ্ট এই খুন সম্বন্ধে একটি যথার্থ সত্য বিবৃতি আমাদের কাছে দিয়েছে।

এর পর আমরা শেওড়াফুলিতে গিয়ে গৌরীয়ার স্ত্রীলোকের বাড়িতে গৌরীয়াকে খুঁজে বার করেছিলাম। সেখানকার মেয়েরা খোকাকে ভালো রূপেই চিনতো। তারা সাক্ষ্য দিল যে, সত্য সত্যই খোকা সেখানে গিয়ে গৌরীয়াকে মারধোর করে গিয়েছে। এ ছাড়া গৌরীয়া নিজেও কেষ্টর বিবৃতি অনুযায়ী একটি বিবৃতি দিয়েছিল। এই সম্বন্ধে গৌরীয়াকে আমি কয়েকটি প্রশ্নও করেছিলাম। সেই প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

প্রঃ—তুমি খোকা ও তার দলবলের সঙ্গে অতদূর গিয়েও পরে সরে পড়েছিলে কেন? তুমি কি খুনে নও, তুমি কি শুধু চুরি করো?

উঃ—আজ্ঞে না। আমি খুনীও নয় কিংবা চোরও নয়। আমি গঙ্গা পার হয়ে তাদের সঙ্গ নিয়েছিলাম চোরাই মালের আশায়। আমি মশাই একজন নিরীহ থাউ, যাকে আপনারা বামাল গ্রাহক বা চোরাই মালের গ্রহীতা বলেন, আমরা নিজেরা কখনও চুরি-চামারি করি না। খুন খারাপিকেও আমরা ভয় করি।

প্রঃ—তোমার কি মনে আছে যে, কতো রাত্রে ওদের সঙ্গে গঙ্গার ধারে তোমার দেখা হয়েছিল? কোন মাস বা তারিখ সেদিন ছিল, তা মনে করে বলতে চেষ্টা করো। ঐ সময়কার অন্য কোনও এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি এই ঘটনার তারিখ, সময় ও মাস বলবার চেষ্টা করো।

উঃ—ঘটনার মাস বা তারিখ আমার মনে নেই। তবে গঙ্গা পার হবার রাত্রেয় ঐ সময়টাতে পূর্ণ চাঁদ উঠেছিল। এর আগের দিন হাওড়ার ঘাটে ওখানকার হবুনাথ গুণ্ডা ধরা পড়েছিল। ওখানকার থানার নথিপত্র হতে তারিখটা আপনি জেনে নিতে পারেন।

গৌরীয়ার এই বিবৃতি লিপিবদ্ধ করে আমি একটা বর্ষ-পঞ্জিকা

আনিয়ে নিলাম। এই পঞ্জিকা হতে জানতে পারলাম যে, আমাদের কাছে গৌরীয়া সত্য কথাই বলেছে। এরপর এই পঞ্জিকাটি আমি বিচারের সময় আদালতে পেশ করার জন্যে উহাকে প্রদর্শনীদ্রব্যের তালিকাভুক্ত করে নিলাম। এই পঞ্জিকা অনুধাবন করে জজ ও জুরিরাও গৌরীয়ার এই বিবৃতি সত্য বলে মেনে নেবেন বুঝেই আমি পঞ্জিকাটি বিশেষরূপে সংরক্ষণ করি।

এই ভাবে মূল হত্যাকাণ্ড প্রমাণ করার পক্ষে আমরা প্রচুর সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহের মূলে ছিল এই হত্যা-মামলার অন্যতম আসামী কেষ্ট বাবুর স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি। এদেশের আইনে পুলিশের নিকট কোনও আসামীর স্বীকৃতি আদালতে প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও উহা এই মামলার প্রধান আসামীদের—খোকা, গোপী ও কেষ্টর ভাগ্য চূড়ান্তরূপে নির্ধারিত করে দিলে। প্রকৃত পক্ষে এই আসামী কেষ্ট বাবুর বিবৃতি অনুযায়ী আমি এই মামলার অন্যতম সাক্ষী সত্য গোয়ালা, হারু গোঁসাই, গৌরীয়া, ফণী এবং সাধু বাবাকে খুঁজে বার করতে পেরেছিলাম। এ ছাড়া কেষ্টর বিবৃতি অনুযায়ী মেথরগলি খোঁদল থেকে খোকার রক্তরঞ্জিত জুতা জোড়াটিও উদ্ধার করতে পেরেছি। মলিনা ও তার ভৃত্যকে ঐ জুতা জোড়াটি দেখানো মাত্র তারা বলে দিতে পেরেছিল যে ঐ জুতা জোড়ার মালিক খোকা বাবু। তাদের বিবৃতি অনুযায়ী জানা গেলো যে গত বৎসর খোকা তাদের নিয়ে পুরীধামে বেড়াতে গিয়েছিল এবং সেখানকার একটি দোকান হতে খোকা তাদের সম্মুখেই ঐ জুতা জোড়াটি ক্রয় করেছিল। এ ছাড়া গৌরীয়া ও তার বন্ধু ফণী শেওড়াফুলির ঘটনাটিও সমর্থন করে। তারা তাদের বিবৃতিতে বলে যে গৌরীয়া গঙ্গার ধার হতে পালিয়ে শেওড়াফুলির একটি কুলটা নারীর বাড়িতে এসে বসবাস করছিল। খোকা বাবু তাদের ঠিকানাটা সংগ্রহ করে

ঐখানে এসে গৌরীয়াকে তার অবাধ্যতার জন্য মারধোর করে যায়। গৌরীয়ার বন্ধু ফণী তাকে রক্ষা করতে এলে সেও খোকা কর্তৃক জখম হয়েছিল।

এই ভাবে সাক্ষী-সাবুত সংগ্রহ করার পর সাক্ষীদের দ্বারা আসামীদের মিছিল সনাক্তকরণের প্রয়োজন হয়। এই জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে আবেদন করে পাটনা হাইকোর্টের মাধ্যমে আমরা বিহার প্রদেশের জেল হতে খোকা বাবুকে সশস্ত্র বাহিনীর পাহারায় কোলকাতার চিফ্‌ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আনিয়ে নিই। বাঙ্গলা দেশে এলে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম মত খোকাকে প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয়েছিল। তদন্তের কারণে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তাকে আমরা পুলিশ হেপাজতিতে নিতে সাহসী হইনি। এর পর আসামীদের জন্য মিছিল সনাক্তকরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই পদ্ধতিতে আসামীদের অনুরূপ চেহারার ও বেশভূষার কয়েকজন বাহিরের ব্যক্তির সহিত তাদের একত্রে মিশিয়ে দিয়ে সাক্ষীদের একে একে সেখানে এনে তাদের সনাক্ত করতে বলা হয়ে থাকে। এইরূপ সনাক্তকরণ ব্যবস্থা জেলের মধ্যে জনৈক হাকিম কর্তৃক সমাধিত হয়। বলা বাহুল্য, এইরূপ বিশেষ ব্যবস্থা তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের অসাক্ষাতেই করা হয়ে থাকে।

প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে এই সনাক্তকরণ মিছিলের ব্যবস্থা করা হলে হাকিমের সম্মুখে সাক্ষীদের একে একে এনে আসামীদের সনাক্ত করতে বলা হয়। সাক্ষী সত্য গোয়ালা এবং হারু গোঁসাই প্রতিটি আসামীকেই সনাক্ত করে বলে যে, তারা এদের সকলকেই পাগলাকে ট্যাক্সি করে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু সাক্ষী গৌরীয়া কেবলমাত্র গোপী, কেষ্ট ও খোকাকে সনাক্ত করে বলে যে,

সে এদের অন্যান্য কয়েক জনের সঙ্গে গঙ্গার ধার দিয়ে পাগলাকে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছিল। অপর দিকে সাক্ষী সাধু বাবা কেবলমাত্র খোকাকে সনাক্ত করে বলেছিল যে, সে তাকে একটি পুঁটলি ঐ রাত্রে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করতে দেখেছে। তবে সে এ কথাও বলে যে, খোকার সঙ্গে সে একজন কৃষ্ণবর্ণের ব্যক্তিকে ঐ সময় দেখেছিল, কিন্তু সেই ব্যক্তি এদের মধ্যে এখানে আছে কি না, তা সে বলতে পারবে না। অন্যান্য সাক্ষীরা আসামীদের বিশেষ পরিচিত থাকায় আমরা এইরূপ মিছিল সনাক্তকরণের জন্য তাদের হাকিমের নিকট পেশ করার কোনও প্রয়োজন মনে করিনি। এই ভাবে মূল খুনের মামলার তদন্ত কার্য শেষ করে আমরা অপর একটি বিষয়ে মনোনিবেশ করলাম।

খোকার কৃপানাথ লেনের বাড়িতে এবং তার দেওঘরের আস্তানায় আমরা প্রায় পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার হীরা, জহরত ও অলঙ্কার উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। বলা বাহুল্য, এইগুলি কলিকাতা শহর ও উহার শিল্পাঞ্চলের গৃহস্থবাড়িগুলিতে সিঁদ কেটে বা তালা ভেঙে চুরি করে আনা হয়েছিল। আমরা গত পাঁচ বৎসরের চুরির মামলার নথিপত্র ঘেঁটে উহাদের ফরিয়াদিদের একে একে থানায় ডাকিয়ে এনেছিলাম। এই সময় আমরা ব্যক্তি-মিছিল সনাক্তকরণের অনুরূপ দ্রব্য-মিছিল সনাক্তকরণেরও ব্যবস্থা করি। এক একটি চোরাই গহনা অনুরূপ কয়েকটি গহনার সহিত একত্রে বা পর পর টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখে ফরিয়াদিদের তাদের আপন আপন অপহৃত দ্রব্য বেছে নিতে বলা হয়। কোনও একটি দ্রব্য বহু বৎসর কেহ ব্যবহার করলে উহাতে কোনও চিহ্ন বা মার্কা না থাকলেও মালিকরা উহাকে আপন দ্রব্যরূপে সহজেই চিনে নিতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ অলঙ্কারের ওজন,

মেরামতি দাগ, খিঁচ খাঁচ, ভগ্নাংশ ও আক্ষরিক চিহ্ন হতে ফরিয়াদীরা আপন আপন অপহৃত দ্রব্যগুলি চিনে নিতে পেরেছিল। অপহৃত দ্রব্যাদির এইরূপ সনাক্তকরণের পর আমরা খোকা বাবুর বিরুদ্ধে ৭৫টি সিঁদেল চুরির মামলা নিম্ন আদালতে রুজু করতে পেরেছিলাম। কলিকাতার জনৈক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মি: আই, এস, মুখার্জির আদালতে এই মামলাগুলির বিচার হয়। এই সকল মামলা প্রমাণিত হওয়ায় আদালত কর্তৃক খোকার এক এক বৎসর করে সবশুদ্ধ ৭৫ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বলা বাহুল্য যে, এতোগুলি চুরির মামলা তার বিরুদ্ধে পূর্বাহ্নে রুজু করার প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের ছিল তাকে বেশ কিছুকাল জেলের মধ্যে আটকা রাখা। আমরা জানতাম যে, দৈবক্রমে খুনের মামলা ফেইল করলে আমাদের জীবন সংশয় হয়ে উঠবে। এই জন্যই পূর্বাহ্নে আমাদের এইরূপ এক বিকল্প ব্যবস্থা করে রাখতে হয়েছিল। এই ভাবে খোকা বাবুকে কিছুকালের জন্য জেলে আবদ্ধ করে আমরা ভাবছিলাম যে এইবার কি করা যায়? এদিকে ইন্‌সপেকটার রায় শিউচরণ হত্যার পুরানো পরিত্যক্ত খুনের মামলাটির তদন্ত পুনর্জীবিত করতে মনস্থ করলেন। এমন সময় কুমারটুলির বরেন বাবু নামে এক ভদ্রলোক থানায় এসে একটি চমকপ্রদ খবর দিয়ে গেলো। বরেন বাবুর বিবৃতিটির কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

"আমি এই রকের উপর বসে পাড়ার লোকদের খবরের কাগজ পড়ে শুনাচ্ছিলাম। এইদিন খোকা বাবুর গ্রেপ্তারের খবরটি বেশ ফলাও করে কাগজে বার হয়েছিল। হঠাৎ পাড়ার বিধু বাবু বলে উঠলো, এ কি শুধু পাগলাকে খুন করেছে? গত বছর খোকা শিউচরণকেও খুন করেছিল। প্রাণের ভয়ে এতদিন কাউকে আমি বলি নি। আমি ঐ সময় কুমারটুলির ঐ মিষ্টির দোকানে

বসে পুরী খাচ্ছিলাম। শিউচরণও আমার পাশে বসে জিলিপি খাচ্ছিল। হঠাৎ খোকা এসে শিউচরণকে ধরে তার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে। দোকানে তখন শিউচরণ, দোকানি দুজনা ও আমি উপস্থিত ছিলাম। রাত তখন দশটা হবে। এই দোকানিরা দু'জন আমার ও খোকার সঙ্গে সমভাবেই পরিচিত ছিল। তাই না সে যাত্রা আমি বেঁচে গিয়েছিলাম। খোকার নির্দেশে দোকানি দু'জনা শিউচরণের দেহটা ধরাধরি করে তুলে রাস্তার ওপারে একটা রোয়াকের উপর রেখে দিলে। এর পর খোকা চলে গেলে তারা দোকানের মেঝের উপর বালতি বালতি জল ঢেলে রক্ত ধুয়ে ফেলতে শুরু করলে। এই অবসরে আমিও দোকান হতে সরে পড়েছিলাম।"

এই শিউচরণ হত্যার মামলাটির সময়ও আমি এই থানাতে বহাল ছিলাম। খুনের সংবাদ পেয়ে উর্ধ্বতন অফিসারদের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে ঐ দোকানের নিচে ড্রেনের মধ্যে আমি লাল রঙের জল দেখতে পাই। উহা কাচের গ্লাসে সংরক্ষণ করে পরীক্ষার জন্য রক্তপরীক্ষকের নিকট পাঠাবার জন্য আমি প্রস্তাবও করি। কিন্তু ঐ দোকানের দোকানিরা উহা পানের পিচ বলে প্রমাণ করায় উর্ধ্বতন অফিসাররা উহাই বিশ্বাস করে গেলেন। ইনস্পেক্টার সুনীল রায় এইবার এই বিশেষ সূত্রটির সাহায্যে সাক্ষীসাবুত সংগ্রহ করে এই পুরাতন মামলাটিরও কিনারা করতে সক্ষম হন। এই মামলায় ঐ সংবাদপত্রটি একটি বিশেষ প্রদর্শনী দ্রব্যরূপে গৃহীত হয়েছিল। এর পর আমরা তদন্তকার্য সমাধা করে এই দুইটি খুনের মামলাতেই খোকা বাবু ও অন্যান্য আসামীদের আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুসারে সোপর্দ করি। কিন্তু ইন্সপেক্টার সুনীল বাবু তদন্তকার্যে এইখানেই ক্ষান্ত দেননি।

তিনি এই মামলার ব্যাপারে খোকা বাবুর ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে অনেক খোঁজ খবর করেন। এই সকল তদন্তে জানা যায় যে, খোকা বাবু বহু অনাথা বিধবাকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করেছে। বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে কন্যার বিবাহে অর্থসাহায্যও করেছে। এই সময় একটি চমকপ্রদ ঘটনাও আমাদের গোচরে আসে। কোনও একজন ব্যারিস্টারপত্নীর নিকট সে প্রস্তাব করে যে, তিনি তাঁর হাতের সম্মুখ ভাগে উল্কি দ্বারা 'প্রাণের খোঁদা' শব্দ দুইটি লিখে রাখতে রাজি হলে সে তাঁদের নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করবে। আশ্চর্যের বিষয়, ব্যারিস্টার-দম্পতি তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে ঐ টাকা গ্রহণ করেছিলেন। এইরূপ বহু বাহাদুরি বা ব্রাভাডো সূচক কার্য তার দ্বারা হামেসাই সমাধা হয়েছে। খোকা বাবু তার সাকরেদদের নগরীর বেশ্যানারীদের উপর কখনও অত্যাচার করতে দেয় নি। এই ব্যাপারে সে তার লোকদের নিবৃত্ত করে উপদেশ দিয়ে বলতো—'ওরে তোরা ওদের উপর উৎপীড়ন করিস নি। এক স্থান হতে অপর স্থানে পুলিশের লোক যখন আমাদের হন্যে কুকুরের মত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তখন ওরাই আমাদের আশ্রয় দেয়, আহার্য দেয়, আর সেই সঙ্গে সে আমাদের দয় একজন সাময়িক স্ত্রী। এরা না থাকলে আমাদের অপরাধী জীবনের কোনও মূল্যই যে থাকবে না।' কিন্তু এদের উপর খোকা সহৃদয়তা প্রকাশ করলেও এদের ধনী নাগরদের উৎপীড়ন করে অপ্রত্যক্ষ ভাবে এদের যে ক্ষতি সে করেছিল তার জন্য খোকা বাবুর ধরা পড়ার সংবাদ খবরের কাগজে বার হওয়ার পর এই সকল হতভাগিনী রূপজীবিনীরা দলে দলে তাদের এই উপকারী বন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবে এগিয়ে এসেছিল।

এর পর আমাদের বিশেষ কর্তব্য হলো সাক্ষীদের রক্ষণাবেক্ষণ

এবং আদালতে সুষ্ঠু ভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ পরিবেশন করা। এজন্য দিবা-রাত্র আমাদের সকলকেই বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। শিউচরণ হত্যা-মামলায় তবু একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডে খোকা বাবুর সহকারী হিসাবে দোকানি দুজনাকেও চালান দেওয়ায় আমাদের মাত্র একজন প্রত্যক্ষদশীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। অপর দিকে পাগলা হত্যার মামলায় খুন সম্পর্কে একজন মাত্র প্রত্যক্ষদশীও আমরা উপস্থিত করতে পারিনি। এই বিখ্যাত দুরূহ খুনের মামলাটি প্রমাণ করার জন্যে আমাদের একান্ত ভাবে পরিবেশগত প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। এই খুন কেহ কাহাকেও করতে দেখেনি, অথচ আদালতে এই সকল ধৃত আসামীরাই যে পাগলকে খুন করেছে, তা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণ করতে হবে। এমন বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে, যার একক অবস্থিতির কোনও মূল্য নেই। কিন্তু উহারা একত্রে পরিবেশিত হলে উহার মূল্য হয়ে উঠে অসাধারণ। কোনও ব্যক্তি বিশেষ মিথ্যা বলতে পারে, কিন্তু ঘটনাসম্ভূত পরিবেশ মিথ্যা বলে না। এই পরিবেশগত প্রমাণের সঙ্গে একটি তারের জালের সহিত তুলনা করা চলে। এই তারের জাল কারও উপর নিক্ষেপ করলে যদি উহার ফোকরগুলি বৃহদাকার হয়, তাহলে সে ঐ ফোকরের মধ্য দিয়ে বার হতে পারে। কিন্তু ঐ ফোকরগুলি ক্ষুদ্রায়তন হলে সে উহার মধ্য হতে বার হতে পারবে না। তখন তাকে ঐ জালের কোনও এক দুর্বল অংশ ছিঁড়ে বার হতে হবে। কিন্তু যখন সে তা ছিঁড়তে পারে না, কিংবা উহার ফোকর দিয়েও বার হতে পারে না, তখন তাকে বলা হয় বেড়াজাল।

এইরূপ এক বেড়াজালের সঙ্গে পারিবেশগত প্রমাণের তুলনা করা হয়ে থাকে। কয়েকটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে একত্রিত করলে

উহার সাহায্যে বহু সিদ্ধান্তে আসা যায়। কিন্তু উহাদের সমাবেশ দ্বারা একাধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হলে উহাকে প্রমাণ করা যায় না। এই অবস্থায় অপরাধীদের অপরাধে সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং এই জন্য তারা অতি সহজেই মুক্তি পেতে পারে। তবে যদি এই সকল ঘটনার সমাবেশ দ্বারা মাত্র একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায়, তা হলে উহা একটা প্রমাণরূপে বিবেচিত হবে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা এইরূপ অকাট্য প্রমাণসমূহ আদালতে সুষ্ঠুরূপে পরিবেশন করতে পেরেছিলাম। এর ফলে এই দুইটি মামলাতেই আসামীরা হাইকোর্টের দায়রার বিচারের জন্য নিম্ন আদালত কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল।

এইদিকে হাইকোর্টের বিচারে শিউচরণ হত্যার মামলাটি আমরা সুষ্ঠুরূপে প্রমাণ করতে পারি নি। এর কারণ অসমর্থিত একক সাক্ষীর বিবৃতি সর্ব সময় গ্রহণযোগ্য হয় না। এ ছাড়া দেরিতে ঠিক পথে তদন্ত না হওয়ায় পারিবেশগত প্রমাণ সমূহও আশানুযায়ী সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। ঐগুলি ইতিপূর্বেই বিনষ্ট বা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এইরূপ ভুল পাগলা হত্যার মামলায় আমরা একটুমাত্রও করি নি। এইজন্য এই মামলাটি আমরা আদালতের বিচারযোগ্যরূপে প্রমাণিত করতে পেরেছিলাম। হাইকোর্টে পাগলা হত্যা মামলার বিচারের সময় আমাদের খোকা বাবুর দয়িতা মলিনাকে নিয়ে এক নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মলিনা খোকার বিরুদ্ধে নিষ্ঠার সহিত সাক্ষী দিয়ে সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে এসে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে থাকে। তা ছাড়া আমরা সংবাদ পাই যে খোকাকে আদালতে ডিফেণ্ড করার জন্যে সে নিজব্যয়ে অতিরিক্ত আইনজীবী নিয়োগ করার জন্য গোপনে চেষ্টা করছে। মলিনাসুন্দরীর এইরূপ বিপরীতমুখী দুই প্রকার ব্যবহার আমাকে কম আশ্চর্যান্বিত করে নি। আমি এই ব্যাপারে মলিনাকে একবার

চ্যালেঞ্জ করবার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু সুনীলবাবু আমাকে তৎক্ষণাৎ এই ব্যাপারে নিরস্ত করে বলেছিলেন—'ভুলেও এমন কাজ তুমি করো না। নারীর মন হচ্ছে আজও পর্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। এখনও পর্যন্ত এই মামলার শুনানী শেষ হয় নি। তুমি এই সম্বন্ধে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে তখুনি হিস্টিরিক হয়ে উঠে আমাদের এই মামলা মাটি করে দেবে।' এই মামলা বাংলাদেশের অ্যাডভোকেট জেনারেল তৎকালীন স্ট্যাণ্ডিং কাউনসিল শ্রী এম্, এম্, বাসু, সলিসিটার শ্রী এস্, চৌধুরীর সহায়তায় অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করেছিলেন। এই জন্য তাঁদের প্রতিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাইকোর্টে এই মামলার শুনানীর সময় আমাদের বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

খোকাবাবু আত্মপক্ষ সমর্থনে কোনও আইনজীবীকে নিয়োগ করে নি। কিন্তু এ দেশে দায়রার বিচারে আসামীরা আত্মপক্ষ সমর্থনে অপারগ হলে সরকার বাহাদুরই নিজ ব্যয়ে তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজীবী নিয়োগ করে থাকেন। বলা বাহুল্য যে, খোকাবাবু এবং অন্যান্য আসামীদের সমর্থনের জন্য সরকার বাহাদুর কয়েকজন সুদক্ষ ব্যারিস্টারকে নিয়োগ করেছিলেন। এঁরা বারে বারে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন যে সত্য গোয়ালা, হারু গোঁসাই ও সন্ন্যাসী ঠাকুর ছিল পুলিশের না কি সাজানো সাক্ষী। কিন্তু সকলেই জানে যে ভারতীয় পুলিশ খুনের মামলায় এইরূপ জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় কখনও নেয় নি। খুন সম্পর্কে মূল ধারার সহিত খুনের জন্য ষড়যন্ত্রের ধারাটিও সংযুক্ত ছিল। আমরা আশা করেছিলাম যে আসামী ভূপেন, কালী, সুবল ও নিতাই এই ষড়যন্ত্রের ধারায় অভিযুক্ত হবে। কিন্তু জজ সাহেব জুরিদের চার্জ বুঝাবার সময় একটি বিশেষ প্রশ্ন তুললেন। প্রকৃতপক্ষে কোনখানে খুনের জন্য ষড়যন্ত্র করার সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। গঙ্গার ধারে এসে গৌরীয়ার

প্রশ্নের উত্তরে খোকা বলেছিল—পাগলাকে আমরা ট্যাপ করবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। 'ট্যাপ' অর্থ যে ছুরি-মারা তা প্রমাণিত হয়েছে। জজসাহেবের মতে এইখান হতেই খুনের জন্য ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। এই সময় পর্যন্ত সুবল, কালী, নিতাই ও ভূপেন উপস্থিত না থাকায় তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ টেকে নি। ডিফেন্স কাউন্সিলারের মতে এর আগে পর্যন্ত পাগলাকে যে গোপী, কেষ্ট ও খোকা খুন করবে তা তাদের জানবার কথা নয়।

যাই হোক, পাগলা-হত্যার মামলার বিচারে এদের খালাস পাওয়ার সম্ভাবনাই পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। এইজন্য অবশ্য আমাদের কোনও দুঃখিত হওয়ার কারণ ছিল না। এর কারণ সাক্ষাৎভাবে এই খুনের জন্য তারা দায়ী ছিল না বলেই মনে হয়। কিন্তু আমরা মূল হত্যাকাণ্ড এবং উহার জন্য ষড়যন্ত্র করার অপরাধ, মূল হত্যাকারী খোকা, কেষ্ট ও গোপীর বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহ রূপেই প্রমাণ করতে পেরেছিলাম। তবে শিউচরণ হত্যার মামলাটি আমরা সম্যকরূপে প্রমাণ করতে বোধ হয় পারিনি। জজ ও জুরির বিচারে খোকাবাবুসহ শিউচরণ হত্যার মামলার সকল আসামী সন্দেহাবকাশে খালাস পেয়েছিল। অপর দিকে অনুরূপ কারণে পাগলা-হত্যার মামলায় সুবল, কালী, ভূপেন ও নিতাইকেও আদালত সসম্মানে মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু পাগলা-হত্যার মামলায় জজ ও জুরির বিচারে খোকা, গোপী ও কেষ্ট খুনের জন্য এবং ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। আসামী গোপী ও কেষ্টকে জজ সাহেবের রায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু তিনি খোকাকে মূল হত্যাকারীরূপে বিবেচনা করে তার ফাঁসির জন্য আদেশ প্রদান করেন। ফাঁসির দণ্ডাদেশ খোকা বাবুকে শুনানো হলে সে স্থির ভাবে উক্ত দণ্ডাদেশ শ্রবণ ক'রে বারেক জজ সাহেব [মিঃ খোন্দকার] এবং বারেক জুরি মহোদয়দের দিকে চেয়ে তাঁদের

অভিবাদন জানিয়ে নিচের হাজতঘরে সার্জেন্টদের প্রহরায় প্রফুল্লচিত্তে নেমে আসে। এই সময় একজন ডিফেন্স কাউন্সিলার তার সঙ্গে দেখা করলে খোকা তাকে আমাকে সেখানে ডেকে আনবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু ঐ আইনজীবী মহোদয় মারফৎ তাকে এই বিষয়ে আমার অক্ষমতা জানালে সে বলে উঠেছিল,—'ঘোষাল মশাইকে বলবেন যে চিরদিন আমি কারাগারের চারিটি দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকবো না। তাঁকে বলবেন, শীঘ্রই ফাঁসিকাঠে আমার জীবন অবসান হবে। তিনি তাহলে যেন আমার আত্মার সঙ্গে মুলাকাৎ করবার জন্য প্রস্তুত থাকেন।' এর পর স্বভাবতই ভীত হয়ে আমি মাত্র একবার তার সঙ্গে হাজতঘরে দেখা করেছিলাম। আমাকে দেখে খোকা বাবু অট্টহাস্য করে বলে উঠেছিল,—'ওঃ আপনি এতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভীরু? ছিঃ! আমি আপনাকে আমার মত একজন বীর পুরুষ ভেবেছিলাম। আজকে আমার মন প্রকৃতিস্থ নয়। দয়া ক'রে কাল-পরশু একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার সঙ্গে বিশেষ কয়েকটি কথা আছে।'

আমি কিন্তু নানা কারণে খোকার এই বিশেষ অনুরোধ রক্ষা করে তার সঙ্গে আর দেখা করতে পারিনি। এর পর ৩১ তারিখে জুলাই মাসে ১৯৩৭ সালে সকাল ছয়টার সময় স্নানাহার সেরে খোকা পরিষ্কার কাপড়-জামা পরে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কিছু সেণ্ট ও কিছু ফুল তার শেষ ইচ্ছাস্বরূপ যাচ্ঞা করে। এই ফুল দিয়ে নিজে হাতে মালা গেঁথে সে তা পরে সারা গায়ে পুরানো অভ্যাস মত সুগন্ধি ছিটিয়ে দিয়ে বলে ওঠে—'এইবার নিয়ে চলো আমাকে। আমি প্রস্তুত।' তৎকালীন আলিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীহেমন্ত গুপ্ত (পরে ইনি অ্যাসিস্টেণ্ট কমিশনার হয়েছিলেন) এই সময় ফাঁসিমঞ্চের নিকট উপস্থিত ছিলেন। এঁর কাছে খোকা বাবু আমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে খোঁজ-খবর করেছিল।

এর একটু পরে সহাস্য মুখে খোকা বাবু ফাঁসিকাঠে উঠে তার শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে।

এই বিখ্যাত মামলার ডাইরির ওজন ছিল সাত সের। এই মামলায় আদালতে ৬১ জন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করে এবং ১৩৫টি প্রদর্শনী দ্রব্য (Exhibits) প্রদর্শিত হয়। একত্রিশ দিন ধরে এই মামলার শুনানী হাইকোর্টে হয়েছিল। খোকা বাবু আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। সুন্দরী মলিনাও কিছুকাল হলো গত হয়েছে। যে গলিটাতে পাগলাকে হত্যা করা হয়েছিল, জনসাধারণ আজ আদর ক'রে তার নাম দিয়েছে গলাকাটা গলি।

এর বহু বৎসর পরে দ্বিতীয় যুদ্ধের অবসানের পর আমি ক্রিমিন্যাল হেরিডিটি সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্য ছুটি নিয়ে কিছুদিন আন্দামানে অবস্থান করেছিলাম। এই সময় আমি দ্বীপান্তরিত আসামীদ্বয়ের খোঁজ-খবর করি। এদের একজনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নি। জাপানী অধিকারের সময় হতে সে নিখোঁজ আছে। স্থানীয় লোকদের নিকট হতে আমি জানতে পারি যে যতদিন সে ঐ দ্বীপে ছিল ততদিন সে সৎ ও সাধু জীবনই যাপন করেছে। তাই আজ আমার মনে হয় যে ঐ একটি অপরাধ ছাড়া অন্য কোন অপরাধ জীবনে সে করে নি। এমন কি এই অপরাধটিও সে আদর্শগত ভুল ব্যাখ্যার কারণে বন্ধু খোকাকে সাহায্য করবার জন্যই করেছিল। এরপর অপর জনের আমি খোঁজ করে সন্ধান পেয়েছিলাম। সে সেখানে বিবাহাদি করে একটি মিষ্টির দোকানের মালিক হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে একটি খুনের মামলায় তার দ্বীপান্তর হয়েছিল এবং তদবধি সে এখানে সুখেই আছে; আমি দ্বীপবাসীদের নিকট শুনলাম যে এখানে এসে সে আর কোনও অপরাধ করে নি। বরং বৎসরের পর বৎসর সেখানে সে জনহিতকর বহু কার্যে লিপ্ত থেকেছে। সে সেখানে এখন একজন সৎ ও সাধু

চরিত্রের পরোপকারী ব্যক্তি। এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে এই খুন ছাড়া বোধ হয় সে জীবনে আর কোনও অপরাধ করেনি। এক্ষণে পরোপকার দ্বারা সে তার এই একটিমাত্র পূর্ব অপরাধের গ্লানি ধুয়ে ফেলছে। প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তার ও তার পরিবারবর্গের কল্যাণ করুন। কিন্তু ১৩ বৎসর পর আমাকে দেখে সে একেবারেই চিনতে পারে নি। আমিই যে তার এখানে আসার জন্য দায়ী, তা তাকে না বলেই তার সঙ্গে আমি আলাপ করেছিলাম। কিন্তু খোকাবাবুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হলে তার চোখ দিয়ে অলক্ষ্যে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই জল কেন সে ফেললো, কার জন্যে সে ফেললো, তা আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হই নি।

এই খোকা ওরফে খেঁদাকে আজও পর্যন্ত আমার প্রায়ই মনে পড়ে। সেকালের ও একালের বহু রাজারাজড়া ও ক্ষমতাসীন ব্যক্তি তাঁর মত বহু অপরাধ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করেছে, কিংবা অনুরূপ কার্যে তারা বারে বারে অপরকে সহায়তা করেছে; কিন্তু সে সময় তারা ক্ষমতায় আসীন থাকায় তাদের কোনও বিচারের ব্যবস্থা সমকালীন কারুর দ্বারা করা সম্ভব হয় নি। একমাত্র ইতিহাস বহু বৎসর পরে তাদের বিচার করতে মাত্র ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। জানি না খোকা বাবু পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছেন কিনা? যদি তিনি এই পৃথিবীতে পুনরায় এসে থাকেন তাহলে আমি ঐ নবজাত শিশুটির জন্য মঙ্গল কামনাই করবো।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬